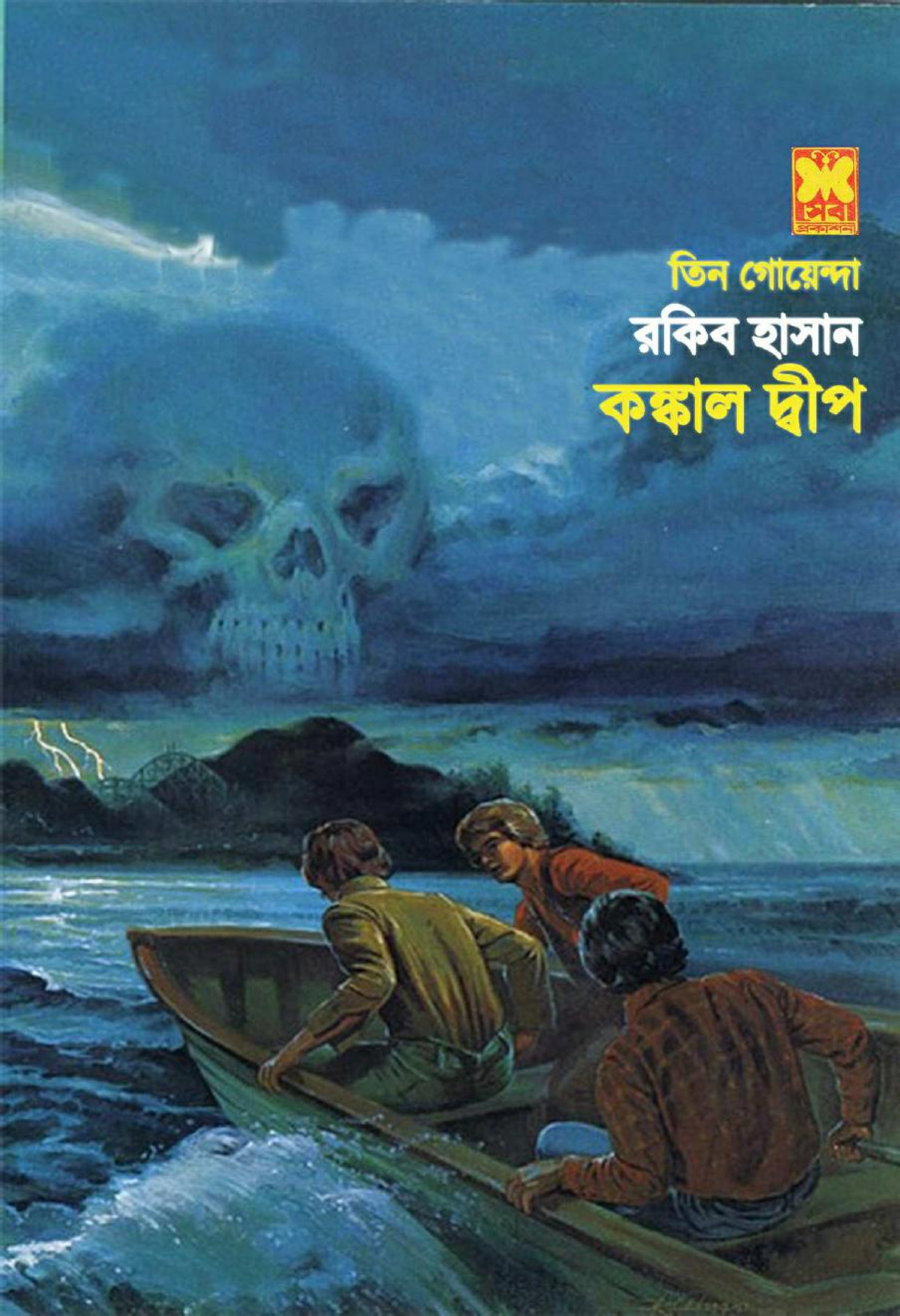
তিন গোয়েন্দা
রকিব হাসান
কঙ্কাল দ্বীপ

# কঙ্কাল দ্বীপ

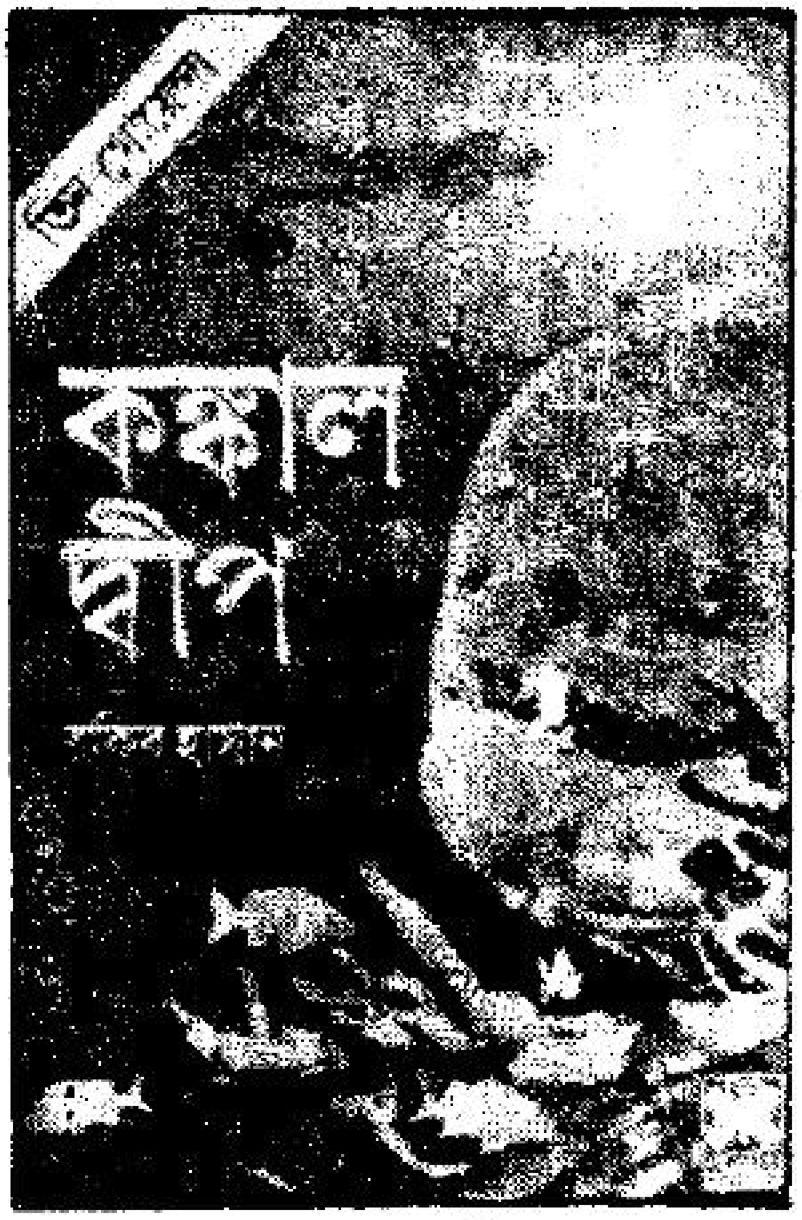


প্রথম প্রকাশ ঃ সেপ্টেম্বর, ১৯৮৫

‘ডুবুরি-পোশাক পরে সাগরে ডুব দিয়েছ কখনও?’ জিজ্ঞেস করলেন ডেভিস ক্রিস্টোফার।

প্যাসিফিক স্টুডিও। বিখ্যাত চিত্রপরিচালকের অফিসে বসে আছে তিন গোয়েন্দা।

বিশাল টেবিলের ওপাশে বসা মিস্টার ক্রিস্টোফারের দিকে চেয়ে বলল মুসা আমান, ‘হ্যাঁ, স্যার, ডুবেছি। গতকাল শেষ পরীক্ষা নিয়েছেন আমাদের ইনস্ট্রাকটর। পাস করেছি ভালভাবেই।’

‘অভিজ্ঞ ডুবুরি নই আমরা,’ যোগ করল কিশোর পাশা। ‘তবে নিয়মকানুন সব জানি। ফেস মাস্ক আর ফ্লিপার আছে আমাদের তিনজনেরই।’

‘গ্যাস ট্যাংক আর অন্যান্য যন্ত্রপাতি?’ জানতে চাইলেন চিত্রপরিচালক।

‘যখন দরকার হয়, ভাড়া করে আনি।’

‘গুড,’ বললেন মিস্টার ক্রিস্টোফার। ‘মনে হয় কাজটা করতে পারবে তোমরা।’

‘কাজ!’ বলে উঠল রবিন।

‘হ্যাঁ,’ বললেন চিত্রপরিচালক। ‘একটা রহস্যের কিনারা করতে হবে। সেজন্যেই ডেকেছি তোমাদের! আর হ্যাঁ, এক-আধটু অভিনয়ও করতে হবে।’

‘অভিনয়?’ ভুরু কোঁচকাল মুসা। ‘কিন্তু আমরা তো স্যার, অভিনেতা নই। কিশোর অবশ্য মাঝেমধ্যে টেলিভিশনে...’

‘অভিজ্ঞ অভিনেতার দরকার নেই ওদের,’ বললেন মিস্টার ক্রিস্টোফার। ‘মুসা, তোমার বাবা কোথায় আছে এখন, জান?’

‘জানি, স্যার,’ অভিজ্ঞ টেকনিশিয়ান মুসার বাবা রাফাত আমান। ছবির শুটিঙের সময় বিভিন্ন যন্ত্রপাতি তদারকির ভার থাকে তাঁর ওপর। ‘ফিলাডেলফিয়ায়।’

‘ভুল বললে,’ হাসলেন পরিচালক। ‘রাফাত এখন একটা দ্বীপে।’

‘কিন্তু বাবা তো গিয়েছিল ডিরেক্টর জন নেবারের সঙ্গে! এসকেপ ছবির শুটিঙে।’

‘জনের সঙ্গেই আছে। ছবির একটা বিশেষ দৃশ্যের জন্যে পুরানো পার্ক দরকার। স্কেলিটন আইল্যাণ্ডে আছে তেমনি একটা পার্ক।’

'স্কেলিটন আইল্যাণ্ড!' ভুরু কুঁচকে গেছে রবিনের। 'শুনে মনে হচ্ছে জলদস্যুদের দ্বীপ।'

'ঠিকই ধরেছ,' বললেন পরিচালক। 'এককালে জলদুস্যদের ঘাঁটি ছিল ওই দ্বীপ। নামটা সত্যিই অদ্ভুত। আজও নাকি ভূতের উপদ্রব রয়েছে ওখানে। বালির তলা থেকে মাঝে মধ্যেই বেরিয়ে পড়ে মানুষের কঙ্কাল। ভীষণ ঝড়ের পর কখনও-সখনও সৈকতে পড়ে থাকতে দেখা যায় সোনার মোহর। বেশি না, একটা দুটো। ভেবে বস না, গুপ্তধন আছে স্কেলিটন আইল্যাণ্ডে। অনেক খোঁজাখুঁজি করা হয়েছে, পাওয়া যায়নি। উপসাগরের তলায় হয়ত ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে কিছু মোহর। ঝড়ের সময় ঢেউয়ের ধাক্কায় সৈকতে এসে পড়ে।'

এবং ওই দ্বীপেই যেতে বলছেন আমাদেরকে?' আগ্রহে সামনে ঝুঁকল কিশোর। 'রহস্যের কিনারা করতে?'

'হ্যাঁ,' এক হাতের আঙুলের মাথা সব একত্র করে মোচার মত বানালেন পরিচালক। দু'জন সহকর্মীকে নিয়ে আছে ওখানে মুসার বাবা। পার্কটার জঞ্জাল পরিষ্কারের জন্যে লোক লাগিয়েছে। কিন্তু গোলমাল শুরু হয়ে গেছে প্রথম দিন থেকেই। জিনিসপত্র চুরি যাচ্ছে। স্থানীয় একজন লোককে পাহারাদার নিযুক্ত করা হয়েছে, কিন্তু চুরি ঠেকানো যাচ্ছে না। ভাবনায় পড়ে গেছে জন। খবর পাঠিয়েছে আমাকে।'

'আমাদের কাজ কি?' জানতে চাইল কিশোর।

'আসছি সে কথায়,' হাত তুললেন মিস্টার ক্রিস্টোফার। 'এসকেপ ছবিটার প্রযোজক আমি। ঠিক করেছি, তোমাদেরকে পাঠাব। নাম যা-ই হোক, দ্বীপটা কিন্তু খুব সুন্দর। চারদিক ঘিরে আছে আটলান্টিক উপসাগর, গভীরতা খুবই কম। ওখানে ইচ্ছেমত ডোবাডুবি করতে পারবে তোমরা। কেউ কিছু সন্দেহ করবে না। ভাববে, তিনটে ছেলে গুপ্তধন খুঁজছে।'

'খুব···খুবই ভাল হবে, স্যার,' বলল কিশোর।

জনের সঙ্গে কোম্পানির একজন লোক আছে, জোসেফ গ্র্যাহাম। দক্ষ ডুবুরি। ভাল ছবি তুলতে পারে, বিশেষ করে পানির তলায়। দরকার পড়লে সে তোমাদেরকে সাহায্য করতে পারবে। আরও একজন আছে, জনের সহকারী, পিটার সিমন্স। সে-ও সাহায্য করবে তোমাদের। তা-ছাড়া মুসার বাবা তো আছেই। গুপ্তধন শিকারির ছদ্মবেশে চোর ধরার চেষ্টা করবে। আর হ্যাঁ, তোমরা গোয়েন্দা, অপরিচিত কারও কাছে সেকথা ঘুণাক্ষরেও প্রকাশ করবে না।'

'খুব মজা হবে! তবে,' রবিনের গলায় দ্বিধা, বাবা যেতে দিলে হয়।'

'না দেবার তো কোন কারণ দেখি না,' বললেন মিস্টার ক্রিস্টোফার। 'খরচ-খরচা সব কোম্পানির। তোমাদের স্কুল ছুটি। তাছাড়া ওখানে মুসার বাবা আছে। দরকার হলে আমিও নাহয় ফোন করব মিস্টার মিলফোর্ডকে। কিশোর, তোমার

কোন অসুবিধে আছে?'

'নাহ্। মুসা আর রবিন যাচ্ছে। তাছাড়া রাফাত চাচা আছে ওখানে, অমত করবে না মেরিচাচী।'

'তো কখন রওনা হচ্ছি আমরা?' পরিচালকের দিকে চেয়ে জিজ্ঞেস করল মুসা।

'আগামী কালই বেরিয়ে পড়,' বললেন মিস্টার ক্রিস্টোফার। 'বাড়িতে গিয়ে জিনিসপত্র গুছিয়ে নাওগে। বিকেলে প্লেনের টিকেট পাঠিয়ে দেব। হ্যাঁ, রবিন, তোমাকে একটা জিনিস দিচ্ছি,' ড্রয়ার খুললেন পরিচালক। একটা বড় খাম বের করে ঠেলে দিলেন টেবিলের ওপর দিয়ে। 'এতে একটা ম্যাগাজিন আছে। রেকর্ড আর রিসার্চের ভার যখন তোমার ওপর, তুমি রাখ এটা। স্কেলিটন আইল্যাণ্ডের ওপর একটা সচিত্র ফিচার আছে। পড়ে দেখ। অনেক কিছু জানতে পারবে দ্বীপটা সম্পর্কে।'

উঠে দাঁড়াল তিন গোয়েন্দা।

'যাত্রা শুভ হোক তোমাদের,' বললেন মিস্টার ক্রিস্টোফার।

'থ্যাংকু, স্যার,' বলে বেরিয়ে এল তিন কিশোর।

# দুই

'ওই যে, কঙ্কাল দ্বীপ!' প্রায় চেঁচিয়ে উঠল রবিন। এই বাংলা নামটা শিখেছে কিশোরের কাছ থেকে। স্কেলিটন আইল্যাণ্ড-এর চেয়ে ছন্দময়।

'কই!...কোথায়!' বলে উঠল কিশোর।

'দেখি দেখি!' বলল মুসা।

দু'জনে একই সঙ্গে ঝুঁকে এল জানালার কাছে, রবিনের গায়ের ওপর দিয়ে।

লম্বা, সরু উপসাগরের ওপর দিয়ে উড়ে চলেছে প্লেন। আঙুল তুলে দেখাল রবিন। তাদের নিচেই একটা ছোট্ট দ্বীপ। ঠিক যেন একটা মানুষের মাথার খুলি।

'ম্যাপের সঙ্গে মিলে যাচ্ছে,' বললো রবিন।

কৌতূহলী চোখে অদ্ভুত দ্বীপটার দিকে চেয়ে আছে তিন গোয়েন্দা। মিস্টার ক্রিস্টোফারের দেয়া ম্যাগাজিন পড়ে জেনেছে ওরা অনেক কিছু। তিনশো বছরেরও বেশি আগে জলদস্যুদের ঘাঁটি ছিল কঙ্কাল দ্বীপ। অনেক খোঁজাখুঁজি করা হয়েছে, পাওয়া যায়নি গুপ্তধন। তার মানে এই নয় যে, ধনরত্ন লুকানো নেই। হয়ত দ্বীপে নেই, কিন্তু উপসাগরের তলায় থাকতে বাধা কোথায়? নিশ্চয় পানির তলায় কোথাও লুকানো আছেই গুপ্তধন। তিন গোয়েন্দার আশা, খুঁজে পাবে ওরা।

আরেকটা ছোট দ্বীপ নজরে পড়ল।

'ওই যে, দ্য হ্যাণ্ড!' বলল কিশোর। 'হস্ত।'

'আর ওগুলো নিশ্চয় দ্য বোনস,' যোগ করল মুসা। আঙুল তুলে দেখাল।

কঙ্কাল দ্বীপ আর হস্তের মাঝামাঝি এক সারি ছোট প্রবাল-প্রাচীর দেখিয়ে বলল মুসা। 'ইয়াল্লা! এত তাড়াতাড়ি এসে পড়লাম! দুপুরের খাওয়াই হজম হয়নি এখনও!'

'দেখ, দেখ!' বলল রবিন। 'হাতের আঙুল। ওগুলো সরু প্রবাল-প্রাচীর! পানির তলায় রয়েছে, অথচ ওপর থেকে কি স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে!'

'হস্তে যাব একদিন,' বলল কিশোর। 'প্রাকৃতিক ফোয়ারা দেখব। কখনও দেখিনি।'

দ্বীপগুলোকে পেছনে ফেলে এল প্লেন। মূল ভূখণ্ডের ওপর এসে পড়েছে। নিচে একটা গ্রাম। নাম ফিশিংপোর্ট। ওখানেই উঠবে তিন গোয়েন্দা। একটা বোর্ডিং হাউসে ঘর ভাড়া করে রাখা হয়েছে তাদের জন্যে।

ফিশিংপোর্ট ছাড়িয়ে এল প্লেন। দ্রুত উচ্চতা হারাচ্ছে। ডানে ছোট্ট একটা শহর। নাম মেলভিল। এয়ারপোর্ট ওখানেই। কয়েক মুহূর্ত পরেই রানওয়ে ছুঁল প্লেনের চাকা। এয়ার টার্মিনাল বিল্ডিঙের সামনে এসে দাঁড়িয়ে পড়ল।

প্লেন থেকে নেমে এল তিন কিশোর। একপাশে তারের জালের বেড়া। বেড়ার ওপাশে লোকের ভিড়।

'রাফাত চাচা এসেছেন কিনা কে জানে!' বলল রবিন।

'ফোনে তো বলল আসবে,' ভিড়ের দিকে চেয়ে হাঁটছে মুসা। 'কোন কারণে নিজে না আসতে পারলে অন্য কাউকে নিশ্চয়ই পাঠাবে।'

বেড়ার বাইরে এসে দাঁড়াল তিনজন। এদিক ওদিক চাইল। মুসার বাবাকে দেখা গেল না।

'অন্য কেউই এসেছে,' নিচু গলায় বলল রবিন। 'ওই যে, আমাদের দিকে এগোচ্ছে।'

ভিড়ের ভেতর থেকে বেরিয়ে এগিয়ে আসছে বেঁটে মোটা এক লোক। লালচে নাক।

'এই যে,' কাছে এসে বলল লোকটা। 'নিশ্চয়ই হলিউড থেকে এসেছ? তোমাদেরকে নিয়ে যেতে পাঠানো হয়েছে আমাকে!' তিন কিশোরকে দেখছে সে। ছোট ছোট চোখে শীতল চাহনি। 'কিন্তু তোমরা গোয়েন্দা! বয়স্ক লোক আশা করেছিলাম আমি।'

স্থির হয়ে গেল রবিনের পাশে দাঁড়ানো কিশোর। 'আমরা গোয়েন্দা আপনার তো জানার কথা নয়!'

'আরও অনেক কিছুই জানি,' দাঁত বের করে হাসল লোকটা। 'এখন এসো। গাড়ি অপেক্ষা করছে। তোমাদের মালপত্র যাবে অন্য গাড়িতে। আমারটায় জায়গা নেই। হলিউড থেকে অনেক জিনিসপত্র এসেছে, বোঝাই হয়ে গেছে।'

ঘুরে দাঁড়িয়ে হাঁটতে শুরু করল লোকটা। পেছনে চলল তিন গোয়েন্দা।

পুরানো একটা স্টেশন ওয়াগনের সামনে এসে দাঁড়াল।

'জলদি উঠে পড় গাড়িতে,' বলল লোকটা। 'আধ ঘন্টা লেগে যাবে যেতে।' আকাশের দিকে তাকাল। 'তার আগেই ঝড় এসে পড়বে কিনা কে জানে!'

আকাশের দিকে মুখ তুলল রবিন। পশ্চিম দিগন্তে ছোট্ট এক টুকরো কালো মেঘ, ছড়িয়ে পড়ছে ধীরে ধীরে। ঢাকা পড়েছে সূর্য। আজ আর বেরোতে পারবে বলে মনে হয় না। মেঘের চূড়ার কাছে বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে থেকে থেকে। ঝড় আসবে, ভীষণ ঝড়।

পেছনের সিটে উঠে বসল তিন কিশোর। ড্রাইভিং সিটে বসল লোকটা। গাড়ি ছাড়ল। এয়ারপোর্ট ছাড়িয়ে এসে রওনা হল উত্তরে।

'আপনার সঙ্গে এখনও পরিচয়ই হল না, মিস্টার...' থেমে গেল কিশোর।

'হান্ট বলেই ডাকবে আমাকে। সবাই তাই ডাকে,' বলতে বলতে এক্সিলারেটরে পায়ের চাপ বাড়াল লোকটা। তাড়াতাড়ি যেতে হবে। দ্রুত নামছে অন্ধকার।

'হ্যাঁ, মিস্টার হান্ট,' আবার বলল কিশোর, 'আপনি কি সিনেমা কোম্পানিতে কাজ করেন?'

'সব সময় না,' জবাব দিল হান্ট। এক মুহূর্ত চুপ করে থেকে আপন মনেই বিড়বিড় করল, 'ঝড় আসছে! রাত নামতে দেরি নেই! নিশ্চয় বেরোবে আজ নাগরদোলার ভূত! ইস্‌স্‌, বোকামিই করলাম! বেরোনেই উচিত হয়নি!'

শিরশির করে একটা শীতল স্রোত নেমে গেল রবিনের মেরুদণ্ড বেয়ে। নাগরদোলার ভূত! কঙ্কাল দ্বীপের ওই ভূতের কথা লেখা আছে ম্যাগাজিনে। বাইশ বছর আগে প্লেজার পার্কের নাগোরদোলায় চড়েছিল এক সুন্দরী তরুণী। নাম, স্যালি ফ্যারিংটন। হঠাৎ উঠল ঝড়। পার্কে আরও অনেকেই এসেছিল সেদিন, তাড়াহুড়ো করে পালাল। থেমে গেল নাগরদোলা। স্যালিকে নামতে বলল দোলার চালক। কিন্তু নামল না মেয়েটা। দোলা আবার চালাতে অনুরোধ করল। ঝড়ের মধ্যে নাগরদোলায় চড়তে কেমন লাগে, দেখতে চায়।

কিছুতেই মেয়েটাকে নামাতে পারল না চালক। ঝড় বেড়েই চলল। নিরাপদ জায়গায় গিয়ে আশ্রয় নিল সে। স্যালি বসে রইল কাঠের ঘোড়ার গলা আঁকড়ে ধরে। হঠাৎ পড়ল বাজ। পড়ল এসে একেবারে নাগরদোলার ওপর।

বজ্রপাতে মারা গেল স্যালি। এর কয়েক হপ্তা পরেই আরেক ঝড়ের রাতে নাকি দেখা গেল, আলো জ্বলে উঠেছে নাগরদোলার। পার্ক বন্ধ হয়ে গেছে বিকেলেই। কে জ্বাললো আলো! কয়েকজন লোক সঙ্গে নিয়ে মোটরবোটে করে দেখতে গেলেন পার্কের মালিক মিস্টার স্মিথ। দ্বীপের কাছে গিয়ে দেখলেন, ঘুরছে নাগরদোলা। একটা কাঠের ঘোড়ায় চেপে বসেছে সাদা একটা মূর্তি। হঠাৎ দপ করে নিভে গেল সমস্ত আলো। থেমে গেল দোলা। কয়েক মিনিট পরে তীরে ভিড়ল

বোট। দোলার কাছে গিয়ে দাঁড়াল লোকেরা। একটা ছোট রুমাল খুঁজে পেল, মহিলাদের রুমাল। এক কোণে সুতো দিয়ে তোলা হয়েছে দুটো অক্ষরঃ এস এফ।

খবরটা ধামাচাপা দেয়ার চেষ্টা করলেন মিস্টার স্মিথ, নইলে বন্ধ হয়ে যাবে পার্ক। কিন্তু গুজব ঠেকানো গেল না। পরদিন সকাল হতে না হতেই ছড়িয়ে পড়ল খবর। লোকে জানল, ভূতের উপদ্রব শুরু হয়েছে পার্কে। ওটার কাছ থেকে দূরে রইল সবাই। পড়ে পড়ে নষ্ট হতে লাগল সাগরদোলা, নাগরদোলা, দোলনা।

স্যালি ফ্যারিংটনের ভূত নাকি আজও দেখা যায়। ইদানীং নাকি বেড়েছে। প্রায় ঝড়ের রাতেই জেলেরা দেখতে পায়, সাদা একটা মূর্তি। ঘুরে বেড়াচ্ছে দ্বীপে। নষ্ট হয়ে গেছে নাগরদোলা। লোকের ধারণা, ওটা আবার চালু হবার অপেক্ষায় আছে স্যালির প্রেতাত্মা।

বহু বছর ধরে নির্জন পড়েছিল কঙ্কাল দ্বীপ। গ্রীষ্মকালে মাঝে মধ্যে দু'চারজন বিদেশী যেত ওখানে পিকনিক করতে, তবে দিনের বেলা।

'সিনেমা কোম্পানি ঠিক করছে আবার নাগরদোলাটা,' বলল হান্ট। 'স্যালির প্রেতাত্মা তাহলে খুব খুশি হবে। আবার চড়তে পারবে...' থেমে গেল সে। জানালার কাচে ধাক্কা দিতে শুরু করেছে ঝড়ো বাতাস। গাড়ি চালনায় মন দিল হান্ট।

পথের দু'ধারে জলাভূমি, লোক বসতির চিহ্নও নেই। আধ ঘন্টা পর একটা জায়গায় এসে পৌঁছুল গাড়ি। সামনে দুদিকে ভাগ হয়ে গেছে রাস্তাটা। বাঁদিকের পথের পাশে মাইলপোস্ট। লেখাঃ ফিশিংপোর্টঃ ২ মাইল। ছেলেদেরকে অবাক করে দিয়ে ডানে গাড়ি ঘোরাল হান্ট। খানিক পরেই শেষ হয়ে এল পিচঢালা পথ। সামনে কাঁকর বিছানো ধুলোভরা কাঁচা রাস্তা।

'মাইলপোস্ট বসানো বাঁয়ের রাস্তার পাশে,' বলেই ফেলল মুসা। 'এ পথে যাচ্ছি কেন আমরা, মিস্টার হান্ট?'

'দ্বীপে নিয়ে যেতে বলেছেন, মিস্টার আমান,' কাঁধের ওপর দিয়ে বলল হান্ট। 'আজ রাতে বোর্ডিং হাউসে যেতে মানা করেছেন।'

'অ!' চুপ করে গেল মুসা। কিন্তু সন্তুষ্ট হতে পারল না। কোথায় যেন একটা খটকা রয়ে গেল!

ঝাঁকুনি খেতে খেতে এগোল গাড়ি। গতি কম। মাইল দুয়েক এসে থেমে পড়ল। হেডলাইটের আলোয় চোখে পড়ল একটা নড়বড়ে জেটি। ছোট, ঝরঝরে একটা মাছ ধরা বোট বাঁধা আছে জেটিতে। 'জলদি বেরোও!' বলল হান্ট। 'গড নোজ! ঝড় এসে গেলেই...'

গাড়ি থেকে নামল তিন গোয়েন্দা। বোটটা দেখে অবাক। এতবড় মুভি-কোম্পানি, এর চেয়ে ভাল কোন বোট জোগাড় করতে পারল না! নাকি হান্টের নিজের বোট ওটা?

'আমাদের মালপত্র?' হান্ট নামতেই জিজ্ঞেস করল কিশোর।

'ওগুলোর জন্যে ভাবতে হবে না তোমাদের,' বলল হান্ট। 'নিরাপদেই পৌঁছে যাবে বোর্ডিং হাউসে। জলদি এসো, বোটে ওঠ। এখনও অনেক পথ বাকি।'

বোটে উঠল ওরা। মোটরের ওপর ঝুঁকল হান্ট। একটা বোতাম টিপে দিতেই স্টার্ট হয়ে গেল পুরানো ইঞ্জিন। ঢেউ কেটে ধুঁকতে ধুঁকতে এগিয়ে চলল বোট। একবার এদিক কাত হচ্ছে একবার ওদিক। ডুবেই যাবে যেন। ভয়ে বুক কাঁপছে তিন কিশোরের।

এল বৃষ্টি। প্রথমে গুঁড়ি গুঁড়ি, জোর বাতাসের ধাক্কায় রেণু রেণু হয়ে আছড়ে পড়ল গায়ে। তারপর নামল বড় বড় ফোঁটায়। পাতলা ক্যানভাসের ঢাকনার তলায় গুটিসুটি হয়ে বসল তিন কিশোর। অল্পক্ষণেই ভিজে চুপচুপে হয়ে গেল।

'রেনকোট নেই?' চেঁচিয়ে বলল মুসা। এভাবে বসে থাকলে বোট ডুবে যাবার আগেই মরব!'

মাথা ঝোঁকাল হান্ট। দড়ি দিয়ে বাঁধল হুইলের একটা স্পোক। দড়ির অন্য মাথা দিয়ে বাঁধল বোটের গায়ে একটা খুঁটির সঙ্গে। কোনদিকেই এখন ঘুরতে পারবে না হুইল। উঠে গিয়ে একটা ছোট আলমারি খুলল। বের করে আনল চারটে হলুদ রেনকোট। একটা নিজে পরল। বাকি তিনটে দিল তিন কিশোরকে।

'পরে ফেল,' চেঁচিয়ে বলল হান্ট। বাতাসের গর্জন, আস্তে কথা বললে শোনা যায় না। 'বোটেই রাখতে হয় এগুলো। কখন বৃষ্টি আসে, ঠিকঠিকানা তো নেই।'

মুসার গায়ে ঠিকমত লাগল কোট, কিশোর আর রবিনের গায়ে বড় হল। তাতে কিছু যায় আসে না এখন। গায়ে পানি না লাগলেই হল।

আবার গিয়ে হুইল ধরল হান্ট। অনবরত বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে। বেড়েছে বাতাসের বেগ। আকারে বড় হয়েছে ঢেউ। ধরেই নিয়েছে ছেলেরা, যে-কোন মুহূর্তে উল্টে যেতে পারে বোট।

বিদ্যুতের আলোয় ডাঙা দেখা গেল সামনে। ছেলেদের মনে হল, জেটি ছাড়ার পর কয়েক যুগ পেরিয়ে গেছে।

ডাঙার কাছে চলে এল বোট। জেটি চোখে পড়ল না। অবাক হয়ে দেখল ছেলেরা, চ্যাপ্টা একটা পাথরের ধারে এসে বোট রেখেছে হান্ট। পানির তলা থেকে বেরিয়ে আছে পাথরটা।

'লাফাও, লাফিয়ে নাম!' চেঁচিয়ে বলল হান্ট। 'গড নোজ!'

নীরবে একে একে লাফিয়ে তীরে নেমে এল ছেলেরা।

'আপনি নামবেন না?' চেঁচিয়ে বলল কিশোর।

ধীরে ধীরে সরে যাচ্ছে বোট। 'নামা যাবে না,' চেঁচিয়ে জবাব দিল হান্ট। 'পথ ধরে এগোও। ক্যাম্পে পৌঁছে যাবে।'

ইঞ্জিনের আওয়াজ বাড়ল। দ্রুত সরে গেল বোট। দেখতে দেখতে হারিয়ে

গেল ঝড়ো রাতের অন্ধকার।

বাতাসের তাড়নায় গায়ে যেন সুচ ফুটাচ্ছে বৃষ্টি। মাথা নুইয়ে রাখতে হল তিন কিশোরকে।

'চল, পাথরটা খুঁজে বের করি!' বলল মুসা।

মাথা ঝুঁকিয়ে সায় দিল কিশোর।

হঠাৎ শোনা গেল শব্দটা। অদ্ভুত। জোরে জোরে শ্বাস নিচ্ছে যেন কোন বিশাল দানব। হু-উ-উ-উ-উ-হু-ই-শ-শ! হু-উ-উ-উ-উ-হু-ই-শ-শ!

'শুনছ!' চেঁচিয়ে উঠল রবিন। 'কিসের শব্দ!'

আবার শোনা গেল অদ্ভুত আওয়াজ।

'কিছু একটা আছে দ্বীপে!' বলল কিশোর। 'আবার বিদ্যুৎ চমকালেই দেখার চেষ্টা করব! তোমরাও কর।'

যেদিক থেকে শব্দ এসেছে, সেদিকে তাকিয়ে রইল তিন গোয়েন্দা। বিদ্যুৎ চমকাল। ক্ষণিকের জন্যে দেখল ওরা, ছোট্ট এক দ্বীপে দাঁড়িয়ে আছে। এটা অন্য কোন দ্বীপ, কঙ্কাল দ্বীপ এত ছোট না।

একটা টিলা, উটের কুঁজের মত ঠেলে বেরিয়ে আছে দ্বীপের গা থেকে। আশপাশে ছোটবড় পাথরের ছড়াছড়ি। এদিক ওদিক দাঁড়িয়ে আছে কয়েকটা গাছ, বাতাসের ঝাপটায় মাথা নুইয়ে ফেলেছে। কোন পথ চোখে পড়ল না, দেখা গেল না ক্যাম্প।

অদ্ভুত শব্দ হল আবার। ঠিক এই সময় আবার বিদ্যুৎ চমকাল। অবাক হয়ে দেখল তিন কিশোর, কুঁজের ঠিক মাঝখান থেকে তীব্র গতিতে আকাশে উঠে যাচ্ছে পানি, বিশাল এক ফোয়ারা। বাতাসের আঘাতে ইতস্তত বিক্ষিপ্ত হয়ে ছিটকে পড়ছে পানি, অদ্ভুত আওয়াজ হচ্ছে সে-জন্যেই।

'প্রাকৃতিক ফোয়ারা!' বলে উঠল কিশোর। 'কঙ্কাল দ্বীপ না, এটা হস্ত!'

স্তব্ধ হয়ে গেল অন্য দু'জন।

তাদেরকে হস্তে নামিয়ে দিয়ে গেল কেন হান্ট? এই ভয়াবহ ঝড়ের রাতে নির্জন দ্বীপে ফেলে রেখে গেল কেন?

# তিন

কুঁজের গায়ে একটা ছোট্ট খোঁড়ল। ওতেই ঠাঁই নিল তিন গোয়েন্দা। কোনমতে গাদাগাদি করে বসল। কষ্ট হচ্ছে বটে, কিন্তু বাতাস আর বৃষ্টির কবল থেকে রেহাই মিলল এখানে।

কয়েক মিনিট আগে খোঁড়লটা খুঁজে বের করেছে ওরা। নিশ্চিত হয়ে গেছে, এটা হস্ত দ্বীপ। দ্বীপে ক্যাম্প নেই, মানুষ নেই, জেটি নেই, বোট নেই।

'এখানে নামিয়ে দিয়ে গেল কেন হান্ট,' কপালে লেগে থাকা পানির কণা মুছতে মুছতে বলল মুসা, 'বুঝতে পারছি না!'

'ভুল করেছে হয়ত,' বলল রবিন। 'কঙ্কাল দ্বীপ ভেবে হস্তে নামিয়ে দিয়ে গেছে।'

'না,' মাথা নাড়ল কিশোর। 'ভুল করেনি। ইচ্ছে করেই এখানে ফেলে গেছে ব্যাটা। প্রথম থেকেই লোকটাকে ভাল লাগেনি। আমরা গোয়েন্দা, জানল কি করে! কোথাও কিছু একটা গোলমাল হয়েছে!'

'যা খুশি হোকগে,' মুসার গলায় হতাশা। না খেয়ে না মরলেই হল। কেউ আমাদেরকে খুঁজে...'

'সকালে খুঁজে পাবে,' বলল কিশোর। 'ভোর রাতেই মাছ ধরতে বেরোয় জেলেরা।'

'কিন্তু এদিকে কোন জেলেনৌকা আসার কথা না,' রবিনের গলায় সন্দেহ। 'পড়নি, এক ধরনের লাল পরজীবি কীটের আক্রমণে নষ্ট হয়ে গেছে এখানকার ঝিনুক? খাওয়া নিরাপদ নয়। মেলভিলের একেবারে দক্ষিণে ঝিনুক তুলতে যায় এখন জেলেরা। ফিশিংপোর্টের এদিকে আসে না। আর কিছুদিন এভাবে চললে গ্রাম ছেড়ে চলে যাবে সবাই।'

'তবু, কেউ না কেউ আসবেই,' জোর দিয়ে বলল কিশোর। 'আমরা নিরুদ্দেশ হয়েছি, জানবেন রাফাত চাচা। খোঁজখবর শুরু হয়ে যাবে। আজ এখানে নেমে বরং ভালই হল। ফোয়ারাটা দেখতে পেলাম।'

আর বিশেষ কিছু বলার নেই কারও। চুপ হয়ে গেল ওরা। বাইরে ঝড়-বৃষ্টি হচ্ছে, কিন্তু খোঁড়লের ভেতর মোটামুটি নিরাপদ। যেমন হঠাৎ আসে, তেমনি হঠাৎই আবার চলে যায় এ-অঞ্চলের ঝড়। তিন কিশোর আশা করল, সকাল নাগাদ থেমে যাবে। শিগগিরই ঢুলতে শুরু করল ওরা।

হঠাৎ তন্দ্রা টুটে গেল মুসার। কোথায় আছে বুঝতেই পেরিয়ে গেল কয়েক মুহূর্ত। তারা চোখে পড়ল। ঝড় থেমে গেছে। তন্দ্রা ছুটে যাবার এটাই কি কারণ? না। চোখে আলো পড়েছিল। এখন আবার পড়ল। শ'খানেক গজ দূর থেকে আসছে, তীব্র আলোর রশ্মি। এক মুহূর্ত স্থির থাকল, তারপরই সরে গেল আবার আলো।

লাফিয়ে দাঁড়াতে গিয়ে মাথায় বাড়ি খেল মুসা। 'ইয়াল্লা!' বলে চেঁচিয়ে উঠে আবার বসে পড়ল। সাবধানে হামাগুড়ি দিয়ে বেরিয়ে এল খোঁড়লের বাইরে। গা থেকে রেনকোট খুলে নাড়তে নাড়তে চেঁচিয়ে বলল, 'এখানে! আমরা এ-খা-নে!'

মুসার পাশে এসে দাঁড়াল রবিন আর কিশোর।

আবার আলো পড়ল মুসার গায়ে। তারপরই সরে এসে পড়ল রবিন আর কিশোরের ওপর। এক মুহূর্ত স্থির রইল। চকিতের জন্যে একবার উঠে গেল

আকাশের দিকে। একশো গজ দূরে নৌকার পাল দেখতে পেল তিন গোয়েন্দা।

'দ্বীপের গায়ে ভিড়েছে নৌকা!' বলে উঠল মুসা। 'আমাদেরকে যেতে বলছে...'

আকাশে তারার আলো। আবছা অন্ধকার। হাঁটতে শুরু করল তিন গোয়েন্দা।

আবার জ্বলে উঠল টর্চ।

'দেখ দেখ!' চেঁচিয়ে উঠল রবিন। 'আমাদেরকে পথ দেখাচ্ছে!'

বৃষ্টিতে ভিজে পিচ্ছিল হয়ে আছে মাটি। দৌড়ানো তো দূরের কথা, তাড়াতাড়ি হাঁটাই যাচ্ছে না। তাড়াহুড়ো করতে গিয়ে একবার আছাড় খেল মুসা। পাথরে ঘষা লেগে ছড়ে গেল হাঁটু।

পানির কিনারে এসে থামল তিন গোয়েন্দা। তীরে ভিড়েছে ছোট একটা পালতোলা নৌকা। পাশে বালিতে দাঁড়িয়ে আছে তাদেরই বয়েসী এক কিশোর। পরনে পানি নিরোধক জ্যাকেট। প্যান্টটা গুটিয়ে হাঁটুর কাছে তুলে নিয়েছে।

তিন গোয়েন্দার মুখে আলো ফেলল ছেলেটা। দেখল। তারপর নিজের মুখে আলো ফেলে দেখাল ওদেরকে। হাসিখুশি একটা মুখ। রোদেপোড়া তামাটে চামড়া। কোঁকড়া কালো চুল। কালো উজ্জ্বল এক জোড়া প্রাণবন্ত চোখ।

'হাল্লো!' ইংরেজিতে বলল ছেলেটা। কথায় বিদেশী টান। 'তোমরা তিন গোয়েন্দা, না?'

অবাক হল তিন কিশোর। তাদের পরিচয় এখানে গোপন নেই কারও কাছেই! ঢোল পিটিয়ে জানানো হয়েছে যেন!

'হ্যাঁ, আমরা তিন গোয়েন্দা,' বলল কিশোর। 'খুঁজে পেলে কি করে?'

'কোথায় খুঁজতে হবে, জানতাম,' বলল ছেলেটা। মুসার সমান লম্বা। হালকা-পাতলা। 'আমি পাপালো হারকুস। পাপু ডাকে বন্ধুরা।'

'তো, পাপু,' বলল মুসা। হাসিখুশি ছেলেটাকে ভালই লাগছে তার। 'কোথায় খুঁজতে হবে, কি করে জানলে?'

'অনেক লম্বা কাহিনী,' বলল পাপালো। 'এসো, নৌকায় ওঠ। সিনেমা কোম্পানির লোকজন খুব ভাবনায় পড়ে গেছে।'

'এসকেপ ছবিতে কোন কাজ করছ তুমি?' নৌকায় উঠতে উঠতে জিজ্ঞেস করল রবিন।

'না না,' ধাক্কা দিয়ে নৌকাটা বালির ওপর থেকে পানিতে ঠেলে দিল পাপালো। লাফ দিয়ে উঠে পড়ল গলুইয়ে। দাঁড় ধরল। পালে হাওয়া লাগতেই তরতর করে ছুটে চলল হালকা নৌকা। দূরে দেখা যাচ্ছে ফিশিংপোর্ট গ্রামের আলো।

কথায় কথায় তিন গোয়েন্দার কাছে নিজের পরিচয় দিল পাপালো! বাড়ি গ্রীসের এক ছোট্ট গাঁয়ে। বড় হয়েছে ভূমধ্যসাগর উপকূলে। মা নেই। বাবা স্পঞ্জ

শিকারি জেলে। সাগরের তল থেকে স্পঞ্জ তুলে বিক্রি করত। এই ছিল জীবিকা।

খুব দরিদ্র গ্রীসের স্পঞ্জ শিকারিরা। ডুবুরির সাজ-সরঞ্জাম কেনার পয়সা নেই তাদের। ফলে কোন যন্ত্রপাতি ছাড়াই ডুব দিতে হয়। দু'হাতে একটা ভারি পাথর নিয়ে পানিতে ছেড়ে দেয় শরীর। দ্রুত ডুবে যায় তলায়। পাথর ছেড়ে দিয়ে স্পঞ্জ কুড়িয়ে নিয়ে ভেসে ওঠে ওপরে। পাপালোর বাবাও এই কায়দায় স্পঞ্জ তুলে আনত। হঠাৎ একদিন আক্রান্ত হল স্পঞ্জ-শিকারির অভিশাপ বেণ্ড রোগে। অকেজো হয়ে গেল। বন্ধ হয়ে গেল রোজগার। কিছুদিন চলল সঙ্গী জেলেদের দয়ায়। ওই সময় ফিশিংপোর্টে জেলের কাজ করত পাপালোর চাচা। ভাইয়ের দুরবস্থার খবর পেয়ে কিছু টাকা পাঠিয়ে দিল। ভাই ভাতিজাকে নিয়ে এল নিজের কাছে।

'কয়েক বছর ভালই কাটল,' বলল পাপালো। 'তারপরই দেখা দিল দুর্ভাগ্য। লাল কীট আক্রমণ করল ঝিনুককে। ব্যবসা খতম। নৌকা বেচে দিয়ে নিউ ইয়র্কে চাকরি নিয়ে চলে গেল চাচা। আমি আর বাবা রয়ে গেলাম এখানে। না থেকেই বা কি করব। মাছধরা ছাড়া আর কোন কাজ জানি না। বাবা পঙ্গু। তাকে নিয়ে কোথায় যাব? চাচার ঘাড়ে গিয়ে সওয়ার হতে ইচ্ছে হল না। নিজেরই চলে না, তবু কিছু কিছু করে বাঁচিয়ে মাসে মাসেই টাকা পাঠায় বাবাকে। খুব কষ্টে দিন কাটে আমাদের। একদিন খবর পেলাম, ফিশিংপোর্টে এক সিনেমা কোম্পানি আসছে। দ্বীপে ক্যাম্প করবে ওরা, ছবির শূটিং করবে। ডুবুরির কাজটা খুব ভাল পারি। আশা হল, একটা কাজ পেয়ে যাব সিনেমা কোম্পানিতে। দ্বীপে ক্যাম্প করবে যখন, নিশ্চয় সাগরের তলায় শূটিং করবে। ডুবুরির দরকার হবে। এল ওরা। গেলাম। কিন্তু কাজ দিল না। আমি বিদেশী। বিদেশীকে দেখতে পারে না এখানকার লোকে। তবে, আশা ছাড়িনি আমি এখনও।

এগিয়ে চলেছে নৌকা। কানে আসছে কঠিন কিছুতে ঢেউ আছড়ে পড়ার শব্দ।

'কোথায় আছি এখন?' জানতে চাইল মুসা। 'অন্ধকারে নিশানা ঠিক রাখতে পার?' অন্ধকারে ডুবো পাহাড়ে বাড়ি লেগে যেতে পারে নৌকা!'

'শব্দ শুনেই বুঝতে পারি আমি, কোন্ পথে চলেছি,' বলল পাপালো। 'ওই যে, ঢেউ আছড়ে পড়ছে প্রবাল প্রাচীরে, বাঁয়ে। দ্য বোনস-এর পাশ দিয়ে চলেছি আমরা। সামনে স্কেলিটন আইল্যাণ্ড।'

সামনে তাকাল তিন গোয়েন্দা। অন্ধকারে পরিষ্কার দেখা গেল না কঙ্কাল দ্বীপ। কিন্তু অবয়বটা মনে গাঁথা আছে ওদের। প্লেন থেকে দেখেছে, খুলির আকার। ম্যাপে দেখেছে। মিস্টার ক্রিস্টোফারের দেয়া ম্যাগাজিন পড়ে জেনেছে অনেক খুঁটিনাটি।

আমেরিকার দক্ষিণ-পূর্ব উপকূলে এই দ্বীপ। একে ঘিরে আছে আটলান্টিক

উপসাগর। ১৫৬৫ সালে আবিষ্কার করেছিলেন এক ইংরেজ নাবিক, ক্যাপ্টেন হোয়াইট। দ্বীপে নেমেছিলেন ক্যাপ্টেন। এটা ছিল তখন স্থানীয় ইণ্ডিয়ানদের গোরস্থান। কবর বেশি গভীর করে খুঁড়ত না ইণ্ডিয়ানরা। ফলে পানি আর বাতাসে কবরের ওপরের বালিমাটি সরে গিয়ে বেরিয়ে পড়ত মরার হাড়গোড়। অনেক কঙ্কাল দেখেছিলেন তিনি। দ্বীপের নাম রাখলেন, স্কেলিটন আইল্যাণ্ড। তারপর কাছের আরেকটা দ্বীপে নামলেন। অনেকটা চৌকোণা ওই দ্বীপ, এক প্রান্ত থেকে লম্বা হয়ে বেরিয়ে গেছে সরু সরু পাঁচটা প্রবাল প্রাচীর। ওটার নাম রাখলেন দ্য হ্যাণ্ড। দুটো দ্বীপের মাঝের একসারি প্রবাল-প্রাচীরের নাম রাখলেন দ্য বোনস। তারপর একদিন আবার জাহাজ নিয়ে চলে গেলেন ক্যাপ্টেন।

এর অনেক বছর পর দ্বীপগুলোর খোঁজ পেল জলদস্যুরা। ওগুলোকে শীতকালের ঘাঁটি বানাল ওরা। আশপাশে তখনও শহর ছিল। ডাকাতি করে আনা সোনার মোহর খরচ করতে যেত ওরা ওসব শহরে। দুর্দান্ত জলদস্যু ব্ল্যাকবিয়ার্ডও এক শীতে বেরিয়ে গিয়েছিল এখান থেকে।

উৎপাত বেড়ে গেল জলদস্যুদের। ইংরেজ নৌ-বাহিনী তাদেরকে তাড়া করে আনল এখান পর্যন্ত। দলবল সহ একে একে মেরে শেষ করল দস্যু সর্দারদের। ১৭১৭ সালে মারা পড়ল ব্ল্যাকবিয়ার্ড। এ-অঞ্চলে বাকি রইল শুধু তখন দুর্দান্ত দস্যু ক্যাপ্টেন ওয়ান-ইয়ার (এক কান কাটা বলেই এই নাম) আর তার দল। ঠাঁই নিল এসে কঙ্কাল দ্বীপে।

গোলমাল শুনে এক রাতে ঘুম থেকে হঠাৎ জেগে উঠল দস্যুরা। দেখল, তাদেরকে ঘিরে ফেলেছে নৌ-বাহিনীর লোক।

নির্বিচারে ডাকাত জবাই শুরু করল নৌ-বাহিনীর লোকেরা। ওয়ান-ইয়ার বুঝল, লড়াই করে টিকতে পারবে না। গোলমালের ফাঁকে একটা লংবোটে করে কেটে পড়ল সে। সঙ্গে নিল তার মোহরের সিন্দুক, আর অতি বিশ্বস্ত কয়েকজন সহচর।

দ্বীপে যে ক'জন ডাকাত ছিল, একটাকেও ছাড়ল না নৌ-বাহিনী, সবকটাকে হত্যা করল। এরপর খেয়াল হল ওদের, এক-কান-কাটা মারা পড়েনি। খোঁজ খোঁজ খোঁজ। বুঝে ফেলল ওরা, পালিয়েছে ওয়ান-ইয়ার জাহাজ নিয়ে তাড়া করল পেছনে। বেগতিক দেখে নৌকার মোড় ফেরাল ডাকাত সর্দার। হন্তে এসে লুকানর চেষ্টা করল। শেষরক্ষা করতে পারল না সে। ধরা পড়ল নৌ-বাহিনীর হাতে।

ইংরেজ জাহাজের ক্যাপ্টেন প্রথমেই জানতে চাইল, মোহরগুলো কোথায়?

খিকখিক করে হেসে উঠল এক-কান-কাটা। বলল, 'সাগর দেবতার খাজাঞ্চিখানায়। চাওগে ওর কাছে। হাতে পায়ে ধরলে দিয়েও দিতে পারে।'

অনেক নির্যাতন করা হল এক-কান-কাটা আর তার সহচরদের ওপর। কিন্তু কেউ মুখ খুলল না। ফাঁসির দড়িতে ঝোলার আগেও বলল না কেউ কোথায় আছে

মোহরগুলো। তন্নতন্ন করে খোঁজা হল হস্ত আর তার আশপাশের দ্বীপগুলো। কিন্তু মোহরের চিহ্নও মিলল না। ধরেই নিল ইংরেজ ক্যাপ্টেন, মোহরগুলো সব উপসাগরে ফেলে দিয়েছে এক-কান-কাটা। ওগুলো আর উদ্ধারের কোন আশা নেই। খানিকটা হতাশ হয়েই দেশে ফিরে গেল ক্যাপ্টেন।

'এদিককার সাগর নিশ্চয় তোমার চেনা, তাই না, পাপু?' সামনের অন্ধকারের দিকে চেয়ে বলল কিশোর।

'নিজের হাতের তালুর মত,' জবাব দিল পাপালো। 'সুযোগ পেলেই এদিকে চলে আসি। ডুব দিই সাগরে। মোহর খুঁজি।'

'শুনেছি,' অনেকেই মোহর খোঁজে এখানে, বলল রবিন। 'পায়ও কেউ কেউ।'

'তুমি পাও-টাও?' পাপালোকে জিজ্ঞেস করল মুসা।

দ্বিধা করল পাপালো। তারপর বলল, 'পাই। তবে ওটাকে না পাওয়া বললেও চলে।'

'শেষ কবে পেয়েছ?' জানতে চাইল কিশোর।

'গত হপ্তায়,' বলল পাপালো। 'কোথায় পেয়েছি, বলব না। এটা আমার সিক্রেট। শক্ত হয়ে বস, মোড় ঘোরাব।'

'মোড় ঘোরালে কেন শক্ত হয়ে বসতে হবে,' জিজ্ঞেস করতে গিয়েও থেমে গেল মুসা। জোরে একবার কেঁপে উঠল নৌকা। একপাশে কাত হয়ে গেল পাল, সেই সঙ্গে নৌকাটাও। পাশে আঘাত হানল ঢেউ। ছিটকে পানি এসে লাগল ছেলেদের গায়ে। শক্ত করে দাঁড় ধরে রইল পাপালো।

আরেকবার কেঁপে উঠেই সোজা হয়ে গেল নৌকা। এগিয়ে চলল আবার। সামনে দেখা যাচ্ছে ফিশিংপোর্টের আলো।

'স্কেলিটন আইল্যাণ্ড এখন পিছনে,' বলল পাপালো। 'গাঁয়ের দিকে এগোচ্ছি আমরা।'

পেছনে ফিরে চাইল তিন গোয়েন্দা। দেখা যাচ্ছে না দ্বীপ। শুধু কালো অন্ধকার।

হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠল রবিন, 'দেখ দেখ! আলো!'

একসঙ্গে জ্বলে উঠেছে অনেকগুলো আলো, ঘুরছে। শোনা যাচ্ছে অদ্ভুত একটা ধাতব শব্দ। আস্তে আস্তে বাড়ছে ঘোরার বেগ। দেখতে দেখতে আলোর এক বিশাল আংটি তৈরি হয়ে গেল।

'ইয়াল্লা!' ফিসফিস করে বলল মুসা। 'নাগরদোলা! নিশ্চয় ঘোড়ায় চেপে বসেছে স্যালি...'

'পাপু!' মুসার কথা শেষ হবার আগেই বলল কিশোর। 'নৌকা ঘোরাও! দেখব, কিসে ঘোরাচ্ছে নাগরদোলা!'

'আমি পারব না!' মাথা নাড়ল পাপালো। 'স্যালির ভূত! ঝড় থেমেছে একটু

আগে। এখন এসেছে দোলায় চড়তে! ইস্‌স্‌, নৌকাটা আরও জোরে চলছে না কেন! একটা মোটর যদি থাকত…'

সোজা ফিশিংপোর্টের দিকে ছুটে চলেছে নৌকা। খুশিই হয়েছে মুসা আর রবিন। হতাশ হয়েছে কিশোর। সত্যিকারের ভূত দেখার ইচ্ছে তার অনেকদিনের। এমন একটা সুযোগ হাত-ছাড়া হয়ে গেল।

অন্ধকারে উজ্জ্বল আলোর রিঙ তৈরি করে ঘুরেই চলেছে নাগরদোলা। বাইশ বছর আগে মরে যাওয়া তরুণীর প্রেতাত্মা…কথাটা ভাবতেই শিউরে উঠল রবিন।

হঠাৎ থেমে গেল ধাতব শব্দ। নিভে গেল আলো। এত তাড়াতাড়ি নাগরদোলা চড়ার শখ মিটে গেল স্যালির প্রেতাত্মার…আশ্চর্য!—ভাবল কিশোর। অন্ধকারের দিকে চেয়ে বসে আছে সে। চিমটি কাটছে নিচের ঠোঁটে।

আরও আধ ঘন্টা পর মিসেস ওয়েলটনের বোর্ডিং হাউসে এসে উঠল তিন গোয়েন্দা। সঙ্গে সঙ্গে টেলিফোনে সিনেমা কোম্পানিকে জানিয়ে দিল মিসেস।

গরম পানিতে গোসল করল তিন গোয়েন্দা। খাওয়া সারল। গরম বিছানায় উঠল।

কম্বলটা গায়ের ওপর টেনে দিতে দিতে বলল কিশোর, 'ভূতটা দেখতে পারলে ভাল হত!'

'আমার তা মনে হয় না,' ঘুমজড়িত গলায় বলল মুসা। শুয়ে পড়ে কম্বলটা টেনে নিল গায়ের ওপর।

রবিন কিছু বলল না। ঘুমিয়ে পড়েছে।

# চার

ঘুম ভাঙল রবিনের। চোখে পড়ল ঢালু হয়ে নেমে যাওয়া চাল। মনে পড়ল, বাড়িতে নেই সে। রকি বীচ থেকে তিন হাজার মাইল দূরে ফিশিংপোর্টের এক বোর্ডিং হাউসে শুয়ে আছে।

উঠে বসে চারদিকে তাকাল রবিন। একটা ডাবল-বাংকের ওপরের তাকে রয়েছে। নিচের তাকে ঘুমাচ্ছে মুসা। কয়েক ফুট দূরে আরেকটা বাংকে কিশোর।

আবার শুয়ে পড়ল রবিন। আগের রাতে ঘটে যাওয়া ঘটনাগুলো ছবির মত খেলতে লাগল মনের পর্দায়।

দরজায় টোকা দেবার শব্দ হল। খুলে গেল পাল্লা। ঘরে এসে ঢুকল হাসিখুশি, বেঁটে-মোটা এক প্রৌঢ়া। মিসেস ওয়েলটন, বাড়িওয়ালি। রবিনকে জেগে থাকতে দেখে বলল, 'এই যে, ওঠ, উঠে পড়। নাস্তা তৈরি। নিচে দু'জন লোক দেখা করতে এসেছেন তোমাদের সঙ্গে। পাঁচ মিনিটের মধ্যে এসো।'

বেরিয়ে গেল মিসেস ওয়েলটন।

লাফ দিয়ে বাংক থেকে নেমে এল রবিন। মুসা কিংবা কিশোরকে ডাকতে হল না। বাড়িওয়ালির গলা শুনে জেগে উঠেছে দু'জনেই।

দ্রুত তৈরি হয়ে নিচে নেমে এল ওরা। উজ্জ্বল হলুদ রঙ করা ডাইনিং রুমের দেয়াল, ছাত। সামুদ্রিক জীবজন্তুর খোলস দিয়ে সাজানো হয়েছে। টেবিলে নাস্তা তৈরি। এক ধারে দুটো চেয়ারে বসে কফি খাচ্ছে দু'জন লোক। কথা বলছেন নিচু গলায়।

ছেলেদেরকে ঢুকতে দেখেই উঠে দাঁড়াল একজন। বিশালদেহী! কুচকুচে কালো গায়ের রঙ। কোঁকড়া চুল। হাসলেন। ঝিক করে উঠল ঝকঝকে সাদা দাঁত। 'কেমন আছ তোমরা, মুসা!' ঠিক প্রশ্ন নয়। জবাবের অপেক্ষা না করেই বললেন মিস্টার রাফাত আমান, 'গতরাতেই এসেছিলাম। ঘুমিয়ে পড়েছিলে। আর জাগালাম না। তাড়াতাড়ি ফিরে যেতে হয়েছে আবার দ্বীপে। উফ্ফ্, যা ভাবনায় পড়েছি না! প্রতিটি মিনিটই পাহারা দিয়ে রাখতে হয় জিনিসপত্র। কাঁহাতক আর পারা যায়!' থামলেন তিনি। তিন কিশোরের ওপর চোখ বুলিয়ে আনলেন একবার। তারপর বললেন, 'তারপর? তোমাদের কাহিনী বল। গতরাতে কি হয়েছিল?'

চেয়ারে বসা দ্বিতীয় লোকটির ওপর চোখ মুসার।

'পরিচয় করিয়ে দিচ্ছি,' বললেন মিস্টার আমান। 'ইনি মিস্টার হোভারসন। এখানকার পুলিশ-চীফ।'

পরিচয়ের পালা শেষ হল। চেয়ারে এসে বসল তিন গোয়েন্দা। নাস্তার ফাঁকে ফাঁকে জানাল তাদের কাহিনী।

পাইপ দাঁতে কামড়ে ধরে চুপচাপ সব শুনলেন হোভারসন। হান্টের কথা আসতেই হাত তুললেন। 'হান্ট! চেহারা কেমন?'

জানাল ছেলেরা।

'হুম্‌ম্!' চিন্তিত ভঙ্গিতে মাথা দোলালেন পুলিশ-চীফ। 'হান্ট গিল্ডার মনে হচ্ছে!'

'চেনেন নাকি?' জিজ্ঞেস করলেন মিস্টার আমান।

'ভালমত। কয়েকবার জেল খেটেছে। টাকার জন্যে পারে না, এমন কোন কাজ নেই। ধরতে পারলে কয়েকটা কথা জিজ্ঞেস করতাম!'

'আমারও কয়েকটা প্রশ্ন ছিল,' গম্ভীর হয়ে বললেন মিস্টার আমান। 'জিজ্ঞেস করতাম, কি করে জানল, ছেলেরা আসছে? কি করে জানল, ওরা গোয়েন্দা? আর গতরাতে কেন নির্জন দ্বীপে ফেলে রেখে এল ওদের? ভাগ্যিস, পাপু খুঁজে পেয়েছিল! নইলে জানতেই পারতাম না আমরা!'

'ঠিক,' সায় দিলেন চীফ। 'প্লেন থেকে নেমেছে ওরা, শুধু এটুকুই জেনে-ছিলাম। এরপর কি হয়েছিল, কিছুই বুঝতে পারিনি। রোড ব্যারিকেড দিয়ে গাড়ি থামিয়ে কত লোককে যে জিজ্ঞেস করেছিলাম…।

'পাপু কি করে জানল, তোমরা দ্য হ্যাণ্ডে আছ?' মুসার দিকে চেয়ে জিজ্ঞেস করলেন মিস্টার আমান। 'কি বলেছে?'

মুসা জানাল, একবার জিজ্ঞেস করেছিল, উত্তরটা এড়িয়ে গেছে পাপালো। পরে আর জিজ্ঞেস করার কথা মনে ছিল না। তারপর উঠল ভূতের কথা।

'ভূত দেখেছিলে!' ভুরু কোঁচকালেন মিস্টার আমান। 'অসম্ভব! ঝরের রাতে নাগরদোলা চড়তে আসে ভূত, এটা এ এলাকার একটা গুজব।'

'গুজবই বা বলি কি করে?' বললেন হোভারসন। 'গত দু'বছরে অনেকবার দেখা গেছে ওই ভূত। ঝড়ের রাতে। জেলেরা দেখেছে। স্কেলিটন আইল্যাণ্ডের ধারে কাছে যেতে চায় না এখন আর লোকে।' থামলেন চীফ। হাসলেন। 'বিশ্বাস হচ্ছে না আমার কথা? বেরিয়ে জিজ্ঞেস করে দেখুন লোককে। গতরাতেও দেখা গেছে ভূত, খবরটা ছড়িয়ে পড়েছে সারা গাঁয়ে। অনেকেই শুনেছে নাগরদোলা ঘোরার শব্দ। আলো দেখেছে স্পাইগ্লাস লাগানো টেলিস্কোপ দিয়ে, কেউ কেউ ভূতকেও দেখেছে। নাগরদোলার একটা ঘোড়ায় চেপে বসেছিল নাকি একটা সাদা মূর্তি। এই শেষ কথাটা অবশ্য বিশ্বাস করিনি আমি…'

'কুসংস্কারে খুব বেশি বিশ্বাসী এ গাঁয়ের লোক,' বললেন মিস্টার আমান। মাথা দোলালেন। 'বুঝতে পারছি, আজ আর কেউ যাবে না দ্বীপে কাজ করতে। বিপদেই পড়ে গেলাম দেখছি!'

'আগামীকালও কাউকে নিতে পারবেন বলে মনে হয় না,' বললেন হোভারসন। 'তো, মিস্টার আমান, আমি উঠি। দেখি, হান্টকে ধরতে পারি কিনা। কিন্তু একটা প্রশ্ন বেশি খচখচ করছে মনে, পাপু কি করে জানল ছেলেরা দ্য হ্যাণ্ডে আছে?'

'সন্দেহের কথা?' বললেন মিস্টার আমান। 'আমার কাছে চাকরির জন্যে এসেছিল একদিন। এখানকার লোকে ভাল চোখে দেখে না ছেলেটাকে। ও নাকি চোর। এটা জেনে কাজ দিইনি। আমাদের জিনিসপত্র হয়ত ওই চুরি করে, কে জানে!'

'না, বাবা,' জোরে মাথা নাড়ল মুসা, 'পাপু চোর না! গতরাতে অনেক কথা বলেছি। ওকে ভাল ছেলে বলেই মনে হল। অসুস্থ বাপের দেখাশোনা করে। সময় পেলেই উপসাগরে বেরিয়ে পড়ে নৌকা নিয়ে। মোহর খুঁজে বেড়ায়। না, পাপু খারাপ ছেলে না।'

'মুসা ঠিকই বলছে,' সায় দিলেন পুলিশ-চীফ। 'ছেলেটাকে দেখতে পারে না লোকে, সেটা অন্য কারণে। এখানকার লোক বিদেশী পছন্দ করে না। ওদের ধারণা, যত কুকাজ, সব বিদেশীরা করে।'

'যা-ই বলুন, ছেলেটাকে সন্দেহ করি আমি,' বললেন মিস্টার আমান। 'অসুস্থ বাপকে খাওয়ানর জন্যেই হয়ত চুরি করে। একটা সৎ কাজ করতে গিয়ে

আরেকটা অসৎ কাজের সাহায্য নেয়াকে ভাল বলা যায় না।' উঠে দাঁড়ালেন তিনি। 'ছেলেরা, এসো যাই। এতক্ষণে হয়ত দ্বীপে গিয়ে বসে আছেন মিস্টার নেবার। চীফ, পরে আবার দেখা করব আপনার সঙ্গে। আশা করি, হান্টকে ধরে জেলে পুরতে পারবেন।'

কয়েক মিনিট পর। দ্রুতগতি একটা স্পীডবোটে বসে আছে তিন গোয়েন্দা। কঙ্কাল দ্বীপের দিকে ছুটে চলেছে বোট। ফিশিংপোর্টকে গ্রাম বলা হয়, আসলে ছোটখাট শহর ওটা। ঘুরে দেখার ইচ্ছে ছিল ওদের, কিন্তু সময় মেলেনি।

রাতের বেলা অন্ধকারে কিছুই দেখেনি ছেলেরা। এখন দেখল, অসংখ্য ডক আর জেটি ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে এদিক ওদিক। সেই তুলনায় নৌকা-জাহাজ অনেক কম। বুঝতে পারল, ওগুলো সব চলে গেছে উপসাগরের দক্ষিণে। ফিশিংপোর্টের সীমানা খুব বেশি বড় না। লোকসংখা আগে অনেক ছিল, ইদানীং নাকি কমে গেছে। ব্যবসা ভাল না, থেকে কি করবে লোকে?

কৌতূহলী চোখে কঙ্কাল দ্বীপের দিকে তাকিয়ে আছে ওরা। মাইলখানেক দূরে আছে এখনও। প্রচুর গাছপালা দ্বীপে। উত্তরপ্রান্তে একটা ছোট পাহাড়।

কঙ্কাল দ্বীপের দক্ষিণে একটা পুরানো জেটির গায়ে এসে ভিড়ল বোট। পাশেই খুঁটিতে বাঁধা আরেকটা মোটরবোট। একপাশ থেকে ঝুলছে বিশেষ সিঁড়ি। স্কুবা ডাইভিঙের সময় খুব কাজে লাগে।

জেটির ধার থেকে পথ চলে গেছে। আগে আগে চললেন মিস্টার আমান। পেছনে তিন কিশোর। শিগগিরই একটা খোলা জায়গায় এসে পৌঁছুল ওরা। ঝোপঝাড় কেটে পরিষ্কার করে ফেলা হয়েছে জায়গাটা। একপাশে দুটো ট্রেলার দাঁড়িয়ে আছে। বড় বড় কয়েকটা তাঁবু খাটানো হয়েছে মাঝখানে।

'ওই যে, মিস্টার জন নেবার, ডিরেক্টর,' বললেন মুসার বাবা। 'গতকাল এসে পৌঁছেছেন ফিলাডেলফিয়া থেকে! জরুরি কাজ সেরে আজই ফিরে যাবেন আবার।'

হর্ন-রিম চশমা পরা একজন লোক এগিয়ে আসছেন। বয়েস চল্লিশের কাছাকাছি। পেছনে তিনজন লোক। একজনের চুল ধূসর। সে-ই পিটার সিমনস, এসকেপের সহকারী পরিচালক, পরে জেনেছে তিন গোয়েন্দা। আরেকজনের চুল সোনালি, নাবিকদের মত ছোট ছোট করে ছাঁটা। যুবক। জোসেফ গ্র্যাহাম। তার পাশেই দাঁড়িয়ে আছে বিশালদেহী এক লোক। চওড়া বুকের ছাতি। বাঁ হাতটা ঝুলছে বেকায়দা ভঙ্গিতে, বোঝাই যায় অকেজো। কোমরে ঝুলছে রিভলভার। জিম রিভান, গার্ড।

'আমাদের ক্যাম্প,' তাঁবুগুলো দেখিয়ে বললেন মিস্টার আমান। 'বার্জে করে আনা হয়েছে ভারি মালপত্র। আমরা এখন লোক কম। কয়েকদিন পরে শূটিঙের কাজ শুরু হলেই আসবে আরও অনেকে। আসবে দামি যন্ত্রপাতি। তখন আর ওই তাঁবুতে কুলাবে না। আরও কয়েকটা ট্রেলার দরকার পড়বে।'

কাছে এসে গেলেন পরিচালক।

'সরি, মিস্টার নেবার,' বললেন রাফাত আমান, 'দেরিই হয়ে গেল।'

'না না, ঠিক আছে,' হাত তুললেন পরিচালক। ছেলেদের দিকে একবার তাকালেন। আবার ফিরলেন মিস্টার আমানের দিকে। 'কিন্তু এখানকার অবস্থা তো বিশেষ সুবিধের মনে হচ্ছে না। সবই বলেছে পিটার। আর হপ্তাখানেকের ভেতর সাগরদোলাটা ঠিক না করা গেলে, স্কেলিটন আইল্যাণ্ডের আশা বাদই দেব। ক্যালিফোর্নিয়ায় ফিরে গিয়ে স্টুডিওতেই একটা পার্ক সাজিয়ে নেব। সাগরদোলা আনা যাবে ভাড়া করে। তবে এখানে করতে পারলেই ভাল হত। সবকিছু আসল। তাছাড়া দ্বীপের দৃশ্য, উপসাগরের দৃশ্য, খুবই চমৎকার।'

'আশা করছি, ঠিক করে ফেলতে পারব,' বললেন মিস্টার আমান। 'কাঠমিস্ত্রিকে খবর দিয়ে পাঠিয়েছি।'

'তা পাঠিয়েছেন, কিন্তু আসবে কিনা যথেষ্ট সন্দেহ আছে,' গম্ভীর গলায় বললেন পরিচালক। 'সারা শহর জেনে গেছে, গতরাতে ভূত দেখা গিয়েছে। নাগরদোলা ঘুরেছে।'

'ভূত ভূত ভূত! মুঠো হয়ে গেল মিস্টার আমানের হাত। চেহারা কঠোর। 'ওই ভূতের শেষ দেখে ছাড়ব আমি।'

পায়ে পায়ে এসে পরিচালকের পেছনে দাঁড়িয়েছে জিম রিভান। আস্তে করে কেশে উঠল। 'মাফ করবেন, স্যার, গতরাতের ভূতটা বোধহয় আমিই।'

# পাঁচ

'গতরাতে,' খুলে বলল সব জিম, 'একা ছিলাম আমি দ্বীপে।' মিস্টার আমানের দিকে চেয়ে বলল, 'আপনারা সব চলে গেলেন ছেলেদেরকে খুঁজতে। পাহারা দিচ্ছিলাম। হঠাৎ কানে এল মোটরবোটের শব্দ। চোরটোর এল মনে করে দেখতে চললাম। পার্কের কাছ দিয়ে চলেছি, হঠাৎ মনে হল নাগরদোলাটার কাছে কে যেন দাঁড়িয়ে আছে। এগোলাম। দৌড়ে চলে গেল একটা মূর্তি। তাড়া করলাম, কিন্তু ধরতে পারলাম না। কোথায় জানি লুকিয়ে পড়ল। অবাক হলাম! ব্যাটা নাগরদোলার কাছে কি করছিল? নতুন বসানো মোটরটা চুরি করতে আসেনি তো? পরীক্ষা করে দেখলাম মোটরটা। দুটো স্ক্রু খোলা। হ্যাঁ মোটর চুরি করতেই এসেছিল। আবার স্ক্রু টাইট দিয়ে সব ঠিক আছে কিনা দেখার জন্যে সুইচ টিপলাম। চালু হয়ে গেল মোটর, আলো জ্বলে উঠল, ঘুরতে লাগল নাগরদোলা। ঠিক আছে সব। আবার অফ করে দিলাম মোটর। এটাই দেখেছিল লোকে।'

'কিন্তু ভূত!' বলে উঠলেন মিস্টার আমান। 'সাদা পোশাক পরা ভূত দেখেছে লোকে। এর কি ব্যাখ্যা?'

'রেনকোট পরেছিলাম, স্যার,' বলল গার্ড। 'হলুদ রঙের। হুডও ছিল মাথায়।

দূর থেকে অন্ধকারে সাদা ধরে নিয়েছে লোকে।'

'হুঁ!' মাথা ঝোকালেন মুসার বাবা। 'বুঝেছি। কিন্তু একটা কাজ ভুল হয়ে গেছে, জিম। সকালেই শহরে যাওয়া উচিত ছিল তোমার। তুমিই গতরাতে নাগরদোলা ঘুরিয়েছ, জানিয়ে এলে ভাল করতে।'

'ঠিকই বলেছেন, স্যার,' মাথা নিচু করে বলল জিম। ভুলই হয়ে গেছে।

'এক কাজ কর,' বললেন মিস্টার আমান। 'আরও দু'জন গার্ড নিয়ে এসো ফিসিংপোর্টে গিয়ে। বুঝতে পারছি, একা কুলাতে পারবে না। চোর আবার আসবে। কয়েকজন যদি আসে, একা পারবে না ওদের সঙ্গে। হ্যাঁ, জেলেফেলেদের কাউকে এন না। ওগুলোকে বিশ্বাস নেই। নিজেরাই চুরি করে বসতে পারে। ভাল লোক আনবে।'

'চেষ্টা করে দেখব, স্যার।'

'চোরের ওপর চোখ রাখার জন্যে এনেছিলাম ছেলেদেরকে,' পরিচালককে বললেন মুসার বাবা। 'কিন্তু হল না। সারা শহর জেনে গেছে, ওরা গোয়েন্দা। কি করে জানল, বুঝতে পারছি না!'

'মনে হয় আমি পারছি , স্যার,' বলল জিম। 'ছোট্ট শহর ফিসিংপোর্ট। ঘটনা খুব বেশি ঘটে না ওখানে। ছোটখাট কিছু ঘটলেই সেটা নিয়ে হৈ-চৈ পড়ে যায়। আপনি আর মিস্টার নেবার ফোনে আলাপ করেছেন প্রযোজকের সঙ্গে। শুনেছে অপারেটর। ওই মেয়েগুলো কেমন হয়, জানেনই তো! কোন কথাই পেটে রাখতে পারে না। আর এত বড় একটা খবর, চুরি হচ্ছে সিনেমা কোম্পানির জিনিসপত্র। হলিউড থেকে গোয়েন্দা আসছে তদন্ত করতে। কি করে চেপে রাখবে? আপনারা ফোন ছেড়েছেন একদিকে, অন্যদিকে রঙ চড়িয়ে বন্ধু-বান্ধবদের কাছে খবর পরিবেশন সারা হয়ে গেছে অপারেটরদের। দেখতে দেখতে ছড়িয়ে পড়েছে মুখরোচক খবর।'

প্রায় গুঙিয়ে উঠলেন চীফ টেকনিশিয়ান। 'এসব হতচ্ছাড়া এলাকায় কাজ করাই মুশকিল! শেষ পর্যন্ত হলিউডেই বুঝি ফিরে যেতে হবে!'

'থাকতে পারলেই ভাল হত, রাফাত,' বললেন পরিচালক। 'চেষ্টা করে দেখুন, সাগরদোলাটা ঠিক করতে পারেন কিনা। আমাকে এখুনি ফিরে যেতে হচ্ছে। এদিকটা সামলান, যেভাবে পারেন। জোসেফ, প্লীজ, ফিশিংপোর্টে পৌঁছে দেবে আমাকে?'

'চলুন,' বলল সহকারী-পরিচালক। ঘুরে হাঁটতে শুরু করল জেটির দিকে।

ছেলেদের দিকে ফিরলেন মুসার বাবা। 'চল, পার্কটা দেখিয়ে আনি তোমাদের। জোসেফ ফিরে এলে ডাইভিং করাতে নিয়ে যাবে।'

'খুব ভাল হবে, বাবা, চল,' বলল মুসা।

খুব বেশি হাঁটতে হল না। ধসে পড়া একটা বেড়া ডিঙিয়ে পার্কে ঢুকল ওরা।

পরিত্যক্ত পার্ক। এককালে সাইনবোর্ডে নাম ছিলঃ প্লেজার পার্ক। এখন আর সাইনবোর্ড নেই, অনেক আগেই নষ্ট হয়ে গেছে! দুটো খুঁটির একটা আছে, তা-ও হেলে রয়েছে। সিমেন্টে তৈরি বিশ্রাম নেবার আসনগুলো বেশিরভাগই ভেঙেচুরে নষ্ট হয়ে গেছে। বেঁকেচুরে মরচে ধরে পড়ে আছে ফেরিস হুইলের লোহার কাঠামো। শরীরের অন্যান্য অংশ খুলে ভেঙে পড়ে আছে কাঠামোর কাছেই। খুব শক্ত করে তৈরি হয়েছিল, তাই বাইশ বছরের ঝড়েও কাত করে ফেলতে পারেনি সাগরদোলাটাকে। দাঁড়িয়ে আছে এখনও, তবে শরীরের বেশিরভাগই ক্ষতবিক্ষত। একই অবস্থা হয়েছিল হয়ত নাগরদোলাটারও, কিন্তু এখন মেরামত হয়েছে। জায়গায় জায়গায় নতুন কাঠ। সিরিষ দিয়ে ঘষে তুলে ফেলা হয়েছে রঙ, নতুন করে লাগানো হবে। কেমন যেন ভূতুড়ে চেহারা। এই দিনের বেলায়ও গা ছমছম করে উঠল মুসার।

এই পার্ক আর এর প্রমোদযন্ত্রগুলো কি কাজে লাগবে, খুলে বললেন মিস্টার আমানঃ 'একটা লোককে ভুল করে খুনের দায়ে দণ্ডিত করা হয়েছে, সে-ই নায়ক। আসল খুনী অন্য লোক। পুলিশের হাত থেকে পালিয়ে গেল দণ্ডিত লোকটা। খোঁজখবর নিয়ে বের করে ফেলল কে খুনী। পিছু নিল। টের পেয়ে পালাতে চাইল খুনী। কিন্তু পারল না। তার পেছনে লেগে রইল নায়ক। শেষে স্কেলিটন আইল্যাণ্ডে এসে লুকাল খুনী। শেষ দৃশ্যটা এরকমঃ একদল লোক আসবে এই পুরানো পার্কে পিকনিক করতে। তাদের সঙ্গে মিশে গিয়ে গা ঢাকা দিতে চাইবে খুনী। কিন্তু নায়কের চোখ এড়াতে পারবে না। নাগরদোলায় চড়ার সময় ঠিক তাকে চিনে ফেলবে। তাড়া করবে। মারপিট গোলাগুলি শুরু হবে। ভয় পেয়ে হুড়াহুড়ি ছুটাছুটি শুরু করবে পিকনিকে আসা দলটা। কিছুতেই নায়কের সঙ্গে পেরে উঠবে না খুনী। শেষে গিয়ে উঠবে সাগরদোলায়। দোলাটা চলতেই থাকবে, ওই অবস্থায়ই নায়কের সঙ্গে মারপিট হবে তার। দোলা থেকে পড়ে গিয়ে মরবে খুনী।'

'খাইছে! দারুণ কাহিনী!' প্রায় চেঁচিয়ে উঠল মুসা। 'ছবিটা দেখতেই হবে!'

'এখানে শূটিং করা গেলে, দৃশ্যটা আরও আগেই দেখতে পারবে,' হেসে বললেন মিস্টার আমান। 'তো আমি যাই। কিছু কাজ করি গিয়ে। তোমরা ঘুরেফিরে দেখ। আধঘন্টার ভেতরেই ফিরে আসবে জোসেফ।' পা বাড়াতে গিয়েও থেমে পড়লেন। 'আর হ্যাঁ, খবরদার, গুপ্তধনের খোঁজখবর বেশি কোরো না! লোকে ঘুণাক্ষরেও যদি ভেবে বসে মোহরের খোঁজ পেয়ে গেছ তোমরা, তাহলে সর্বনাশ হবে! দলে দলে লোক ছুটে আসবে। মোহর খুঁজতে শুরু করবে। বারোটা বাজবে শূটিঙের। গত পঞ্চাশ বছরে খুব একটা খোঁজাখুঁজি হয়নি, মোহর পাওয়া যায়নি সৈকতে। লোকে ভুলেই গেছে ব্যাপারটা। ভুলেই থাকতে দাও।'

'পাহাড়ের ওদিকে গেলে কোন ক্ষতি আছে?' জিজ্ঞেস করল কিশোর। 'ওতে

নাকি একটা গুহা আছে। কথিত আছে, জলদস্যুরা বন্দীকে ধরে এনে ওখানে পুরে রাখত।'

'আমিও শুনেছি,' বললেন মিস্টার আমান। 'যেতে চাইলে যাও। কিন্তু আধ ঘন্টার ভেতর ফিরবে।' ঘুরে হাঁটতে শুরু করলেন তিনি।

ঘুরে ঘুরে পার্কটা দেখতে লাগল তিন কিশোর।

'জায়গাটা কেমন যেন ভূতুড়ে!' বিড়বিড় করে বলল মুসা। 'গা ছমছম করছে আমার।'

'কিশোর, তুমি চুপ করে আছ কেন?' জিজ্ঞেস করল রবিন। 'কিছু ভাবছ মনে হচ্ছে?'

'অ্যাঁ...হ্যাঁ,' নিচের ঠোঁটে চিমটি কাটা থামাল কিশোর। 'রাফাত চাচার ধারণা, চুরি করছে জেলেরা। সিনেমা কোম্পানির আর সবারও তাই ধারণা, তোমরা দু'জনও হয়ত এটাই ভাবছ।'

'ভাবছি তো। জেলে ব্যাটাদেরই কাজ,' বলল মুসা। 'ব্যবসা খারাপ। খেতে পায় না। সেজন্যেই চুরি করছে।'

'আমার কিন্তু তা মনে হয় না,' বলল কিশোর।

অপেক্ষা করে রইল রবিন আর মুসা।

যন্ত্রপাতি চুরি করার পেছনে অন্য কারণও থাকতে পারে,' বলল গোয়েন্দা প্রধান। 'কঙ্কাল দ্বীপ থেকে সিনেমা কোম্পানিকে তাড়াতে চাইছে হয়ত কেউ। বাইশ বছর ধরে নির্জন পড়ে আছে দ্বীপটা। তা-ই থাকুক, এটাই হয়ত চায় ওই লোক।'

'টেরর ক্যাসলের ওপর জন ফিলবির যেমন মায়া বসে গিয়েছিল,' হাসল মুসা। 'কঙ্কাল দ্বীপের ওপরও তেমনি কারও আকর্ষণ আছে বলতে চাইছ? নইলে সিনেমা কোম্পানিকে তাড়াতে চাইবে কেন?'

'সেটাই রহস্য,' মাথা ঝোঁকাল কিশোর। 'চল, গুহাটা দেখে আসি।'

পার্ক থেকে বেরিয়ে এল ওরা। গাছপালার ভেতর দিয়ে পাহাড়ের দিকে উঠে গেছে একটা পায়ে চলা পথ। আগের রাতের ঝড়ে ভেঙে পড়েছে অনেক গাছপালা। পথের ওপর ডালপাতা বিছিয়ে আছে। ওসবের মধ্যে দিয়ে চলতে অসুবিধে হচ্ছে, বিশেষ করে রবিনের। তার ভাঙা পা সারেনি পুরোপুরি।

দশ মিনিট পর পাহাড়ের মাথার কাছে উঠে এল ওরা। পাহাড় না বলে বড় টিলা বলাই উচিত। কিন্তু নাম পাহাড়, জলদস্যুর পাহাড়। ঠিক চূড়ার কাছে গুহামুখ, খুদে একটা আগ্নেয়গিরি যেন। ভেতরে উঁকি দিল তিন গোয়েন্দা। অন্ধকার।

ভেতরে পা রাখল ওরা। তেরছা হয়ে নেমে গেছে সুড়ঙ্গ। সুড়ঙ্গ পেরিয়ে একটা গুহায় এসে ঢুকল তিন কিশোর। বেশ বড় হলরুমের মত গুহা। লম্বাটে।

শেষ প্রান্তটা সরু। সুড়ঙ্গ দিয়ে আলো এসে পড়ছে, গুহার ভেতরে আবছা অন্ধকার।

গুহার মাটি আলগা, হাঁটতে গেলে পা দেবে যায়। অসংখ্যবার খোঁড়া হয়েছে প্রতিটি ইঞ্চি, তার প্রমাণ।

নিচু হয়ে একমুঠো মাটি তুলে নিল কিশোর। আঙুলের ফাঁক দিয়ে ছাড়তে ছাড়তে বলল, 'গুপ্তধন খুঁজছে লোকে। গত সোয়াশো বছরে কয় সোয়াশো বার খোঁড়া হয়েছে এখানকার মাটি, আল্লাই জানে! সব গাধা! এমন একটা খোলা জায়গায় এনে গুপ্তধন লুকিয়ে রাখবে, জলদস্যুদের এত বোকা ভাবল কি করে!'

'ঠিক,' মাথা ঝাঁকাল মুসা। আঙুল তুলে সরু প্রান্তটা দেখিয়ে বলল, 'ভেতরে আরও গুহা আছে মনে হচ্ছে! টর্চ আনলে ঢুকতে পারতাম।'

গোয়েন্দাগিরি করছ, গুহায় ঢুকতে এসেছ, টর্চ আননি কেন?' হাসল কিশোর রবিনের দিকে ফিরল, 'তুমি এনেছ?'

'গুহায় ঢুকব, ভাবিনি।'

'আমিও ভাবিনি,' বলল রবিন।

'গোয়েন্দাদের জন্যে টর্চ একটা অতি দরকারি জিনিস, সব সময় সঙ্গে রাখা উচিত,' আবার হাসল কিশোর। 'তবে, আমিও রাখতে ভুলে যাই। আজ গুহায় ঢুকব, জানি, তাই মনে করে সঙ্গে নিয়ে এসেছি!'

গুহার সরু প্রান্তে এসে দাঁড়াল ওরা। টর্চ জ্বালল কিশোর। পাথুরে দেয়াল দেয়ালে অসংখ্য তাক, প্রাকৃতিক। মসৃণ। এখানেই ঘুমাত হয়ত জলদস্যুরা, ঘষায় ঘষায় মসৃণ হয়ে গেছে। কে জানে, বন্দিদেরকে হয়ত হাত-পা বেঁধে এখানেই ফেলে রাখা হত! অসংখ্য ফাটল, খাঁজ দেখা গেল দেয়ালের এখানে ওখানে একপাশে, মাটি থেকে ফুট ছয়েক উঁচুতে একটা খাঁজে এসে স্থির হয়ে গেল টর্চের আলো। সাদা একটা বস্তু। ওপরের দিকটা গোল।

'খাইছে রে!' চেঁচিয়ে উঠল মুসা। ঘুরে দাঁড়িয়েই ছুট লাগাতে গেল। তারপরই ঘটল অদ্ভুত একটা কাণ্ড! চমকে থেমে গেল সে।

তাকের ওপর বসে আছে যেন মানুষের মাথার খুলিটা। চক্ষু কোটর দুটো এদিকে ফেরানো। দাঁতগুলো বীভৎস ভঙ্গিতে হাসছে নীরব হাসি, দুই পাটি দাঁতের মাঝে সামান্য ফাঁক। ওই ফাঁক দিয়েই এল যেন কথাগুলোঃ 'ভাগ, ভেগে যাও জলদি?' দীর্ঘশ্বাস পড়ল। 'আমাকে শান্তিতে একা থাকতে দাও! এখানে কোন গুপ্তধন নেই!'

## ছয়

কথা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গেই ছুটতে শুরু করল মুসা। ঠিক তার পেছনেই রবিন। প্রায় উড়ে চলে এল যেন সুড়ঙ্গমুখের কাছে। পাথরে হোঁচট খেল মুসা। হুমড়ি

খেয়ে পড়ল। তার গায়ে পা বেধে গিয়ে গোয়েন্দা সহকারীর ওপরই পড়ল নথি। দুই সহকারীর গায়ে হোঁচট খেতে গিয়েও কোনমতে নিজেকে সামলে নিল গোয়েন্দাপ্রধান।

হাঁচড়ে পাঁচড়ে উঠে দাঁড়াচ্ছে দুই সহকারী। ফিরে চাইল একবার কিশোর। না, তাড়া করে আসছে না খুলি। পায়ে পায়ে এগিয়ে গেল আবার। নিচু হয়ে তুলে নিল টর্চটা। ভয়ে হাত থেকে খসে পড়েছিল।

'মড়ার খুলি কথা বলতে পারে না,' সময় পেয়ে সামলে নিয়েছে আবার কিশোর। উঠে দাঁড়িয়েছে দুই সহকারী, পেছনে এসে দাঁড়িয়েছে। তাদের দিকে ফিরে বলল, 'কথা বলতে হলে জিহ্বা দরকার, কণ্ঠনালী দরকার। খুলির ওসব কিছুই নেই।'

হা হা করে হেসে উঠল খুলি। চমকে আবার দৌড় দিতে যাচ্ছিল দুই সহকারী, থেমে গেল খাঁজের পেছনে চোখ পড়তেই। না, খুলি হাসেনি। একটা মাথা দেখা যাচ্ছে। কোঁকড়া চুল। খুলি হাতে নিয়ে লাফিয়ে নেমে এল মাথার মালিক। আবার হাসল জোরে জোরে। নিষ্পাপ কালো দুটো চোখের মণি জ্বলজ্বল করছে টর্চের আলোয়।

'তারপর?' খুলিটা পেছনে ছুঁড়ে ফেলে দিল পাপালো হারকুস। 'চিনতে পার?'

'নিশ্চয়,' জবাব দিল কিশোর। 'প্রথমে দৌড় দিয়েছিলাম, তারপরই মনে হল গলাটা কেমন চেনা চেনা। টর্চ তুলে নিতে আসার সাহস করেছি সেজন্যেই।'

'তারমানে, ভয় পাইয়ে দিতে পেরেছি তোমাদের?' আবার হাসল পাপালো। 'জলদস্যুর ভুত ভেবে কি একখান কাণ্ডই না করলে!' মুসা আর রবিনের গোমড়া মুখের দিকে চেয়ে আবার হা হা করে হেসে উঠল সে।

'আমি ভয় পাইনি,' গম্ভীর গলায় বলল কিশোর। 'শুধু চমকে গিয়েছিলাম। মুসা আর রবিন...' দুই সহকারীর পক্ষে সাফাই গাইতে গিয়ে থমকে গেল সে। ভেড়া বনে গেছে যেন মুসা আর রবিন।

'আমিও ভয় পাইনি,' বিড়বিড় করে বলল রবিন। 'পা দুটো কথা শুনল না, কি করবে! খালি ভাগিয়ে নিয়ে যেতে চাইল...'

'আমারও একই ব্যাপার!' বলল মুসা। 'খুলির ওদিক থেকে কথা শোনা যেতেই পা দুটো চনমন করে উঠল। ছুটিয়ে বের করে নিয়ে যেতে চাইল গুহার বাইরে। তাই, ইচ্ছে করেই তো হোঁচট খেলাম...'

হো হো করে হেসে উঠল পাপালো। 'দারুণ কৌতুক! হাঃ হাঃ হাঃ...'

কিশোরও হেসে ফেলল। হাসিটা সংক্রামিত হল মুসা আর রবিনের মাঝেও।

'চল, বাইরে যাই,' হাসি থামিয়ে বলল কিশোর। 'খোলা হাওয়ায় বসে আলাপ করি।'

বাইরে বেরিয়ে এল চার কিশোর। পাহাড়ের গায়ে হেলান দিয়ে হাত-পা

ছড়িয়ে বসল।

'এখানে কখন এলে?' পাপালোকে জিজ্ঞেস করল কিশোর। 'কি করে জানলে, আমরা গুহায় ঢুকব?'

'সহজ,' বলল পাপালো। 'নৌকা নিয়ে ঘোরাফেরা করছিলাম। তোমাদের বোট চোখে পড়ল। কোথায় যাবে, বুঝতে পারলাম। দ্বীপের উল্টো দিকে বোট ভিড়িয়ে নেমে পড়লাম। গাছপালার আড়ালে আড়ালে চলে গেলাম ক্যাম্পের কাছে। দেখলাম, পার্কের দিকে যাচ্ছ। নাগরদোলাটার কাছেই একটা ঝোপের ভেতর লুকিয়ে বসে রইলাম। জানলাম, গুহায় ঢুকবে তোমরা। চট করে ঝোপ থেকে বেরিয়ে গাছের আড়ালে আড়ালে চলে এলাম এখানে। লুকিয়ে বসে রইলাম খাঁজের আড়ালে। খুলিটা ছিল অন্য একটা তাকে। খাঁজে নিয়ে গেছি আমিই।'

'কিন্তু লুকিয়ে দ্বীপে নামতে গেলে কেন?' জানতে চাইল রবিন। 'জেটিতে নৌকা বেঁধে এসে আমাদের সঙ্গে দেখা করলেই পারতে? এতসব লুকোচুরি কেন?'

'গার্ড,' শান্ত গলায় বলল পাপালো। 'জিম রিভানের ভয়ে। দেখলেই তাড়া করে। এখানকার সবাই তাড়া করে আমাকে।' উজ্জ্বল চোখ দুটোতে বিষণ্ণতা।

'কেন?' জিজ্ঞেস করল মুসা।

'লোকের ধারণা, আমি খারাপ,' ধীরে ধীরে বলল পাপালো। 'আমরা গরীব, তারওপর বিদেশী, কাজেই চোর। ফিশিংপোর্টে অনেক লোক আছে, যারা সত্যিই খারাপ। ওরাই চুরি করে, নাম দেয় আমার। বলেঃ ওই গ্রেশান কুত্তাটার কাজ।'

পাপালোর জন্যে দুঃখ হল তিন গোয়েন্দার।

'আমরা তোমাকে অবিশ্বাস করি না, পাপু,' বলল মুসা। 'কত রকমের লোক আছে দুনিয়ায়। মানুষকে কষ্ট দিয়ে মজা পায়। ওদের কথায় কান দিও না...আচ্ছা, গতরাতে এত তাড়াতাড়ি আমাদেরকে খুঁজে পেলে কি করে, বল তো?'

'সেটাই সহজ,' উজ্জ্বল হয়ে উঠল আবার কালো চোখজোড়া। 'হাক স্টিভেনের রেস্তোরাঁয় ঝাড়ু দিই আমি। বাসনপেয়ালা মেজে দিই। দু'ডলার করে পাই রোজ। খুব ভাল লোক হাক। ও সাহায্য না করলে না খেয়েই মরতে হত...

'দু'ডলারে দু'জন মানুষের খাওয়া হয়!' চোখ কপালে উঠল রবিনের। 'বেঁচে আছ কি করে?'

'আছি, কোনমতে,' সহজ গলায় বলল পাপালো। 'পুরানো ভাঙা একটা কুঁড়ে ঘরে ঘুমাই। এক সময় ঝিনুক রাখত ওখানে জেলেরা। কাজে লাগে না এখন, ফেলে রেখেছে। ভাড়া দিতে হয় না আমাকে। সীম আর রুটি কিনতেই খরচ হয়ে যায় দু'ডলার। মাছ ধরতে জানি, তাই বেঁচে আছি। বাবা অসুস্থ। ভাল খাওয়া দরকার। কিন্তু কোথায় পাব? মাঝে মাঝে বাবার কষ্ট দেখলে আর সইতে পারি না। ছুটে বেরিয়ে আসি কুঁড়ে থেকে। পাগলের মত ঘুরে বেড়াই উপসাগরে, খুঁজে ফিরি সোনার মোহর। মানুষের দয়া আমি চাই না, ঈশ্বর আমাকে সাহায্য করলেই

বলেছে।'

অনেকক্ষণ কেউ কোন কথা বলতে পারল না আর। নোনাপানি ছুঁয়ে ছুঁয়ে আসছে হাওয়া, শাঁই শাঁই শব্দ, সাগরের দীর্ঘশ্বাস যেন।

কোমরের বেল্টে গোঁজা ছুরি খুলে নিয়ে খামোকাই মাটিতে গাঁথছে পাপালো। থমথমে পরিবেশ হালকা করার জন্যে হাসল। 'নিজের দুঃখের সাতকাহনই গেয়ে চলেছি! আসল কথা থেকে দূরে সরে গেছি অনেক। হ্যাঁ, কি যেন জিজ্ঞেস করছিলে?'

'গতরাতে এত তাড়াতাড়ি আমাদেরকে খুঁজে পেলে কি করে?' মনে করিয়ে দিল মুসা।

'সকালে হাক স্টিভেনের ওখানে বাসন মাজছিলাম। হঠাৎ কানে এল, হাসাহাসি করছে কয়েকজন লোক। একজন বললঃ গোয়েন্দা, না! গোয়েন্দা আনাচ্ছে! আসুক না আগে! হাত দেখিয়ে ছাড়ব ব্যাটাদের!'

নিচের ঠোঁটে চিমটি কাটতে কাটতে হঠাৎ থেমে গেল কিশোর। 'হাত! শব্দটা কোন বিশেষ ভঙ্গিতে উচ্চারণ করেছিল?'

'তুমি কি করে বুঝলে!' ভুরু কোঁচকাল পাপালো। জবাবের অপেক্ষা না করেই বলল, 'ওই শব্দটা বলার সময় জোর দেয় সে। ঝড়ের সময়ই তোমাদের নিরুদ্দেশের খবর ছড়িয়ে পড়ল। বুঝে গেলাম, কোথায় পাওয়া যাবে তোমাদেরকে।'

'দ্য হ্যাণ্ড...হস্ত...হাত,' বিড়বিড় করল কিশোর। চিমটি কাটছে ঠোঁটে।

পুরানো গলাবন্ধ শার্টের তলায় হাত ঢোকাল পাপালো। 'আমাকে যখন বিশ্বাস কর তোমরা...একটা জিনিস দেখাচ্ছি....' ছুরিটা মাটিতে রেখে চামড়ার তেল চিটচিটে একটা থলে বের করে আনল সে। প্ল্যাস্টিকের সুতোয় বাঁধা মুখ।

বাঁধন খুলল পাপালো। 'চোখ বন্ধ কর সবাই,' হাসি হাসি গলায় বলল, 'হাত বাড়াও।'

হাসল তিন গোয়েন্দা। চোখ বন্ধ করে হাত সামনে বাড়াল।

সবার ডান হাতের তালুতে একটা করে বস্তু রাখল পাপালো। 'এবার চোখ খোল!'

অবাক হয়ে দেখল তিন গোয়েন্দা, তিনটে পুরানো সোনার মোহর।

বুড়ো আঙুলের সাহায্যে চকচকে মুদ্রার ধারটা পরীক্ষা করল রবিন। ক্ষয়ে গেছে। লেখা পড়ল। 'ষোলোশো পনেরো!' চোখ বড় বড় হয়ে গেছে তার। 'এত পুরানো!'

'স্প্যানিশ ডাবলুন!' হাতের মোহরটার দিকে চেয়ে আছে কিশোর। 'জলদস্যুদের গুপ্তধন!'

'ইয়াল্লা!' চেঁচিয়ে উঠল মুসা। 'কোথায়, কোথায় পেয়েছ এগুলো?'

'সাগরের তলায়, বালিতে পড়েছিল,' বলল পাপালো। 'খুঁজলে আরও পাওয়া যেতে পারে। সিন্দুক কোথাও লুকিয়ে রাখেনি ওয়ান-ইয়ার, নৌকা থেকে পানিতে ফেলে দিয়েছিল। অনেক আগের ঘটনা। সিন্দুকটা নিশ্চয় পচে ভেঙে নষ্ট হয়ে গেছে। মোহরগুলো ছড়িয়ে পড়েছে বালিতে। ঢেউয়ের জন্যে এক জায়গায় নেই আর এখন। একটা পেয়েছি স্কেলিটন আইল্যাণ্ডের দক্ষিণে, একটা ডুবে যাওয়া ইয়টের কাছে। সুন্দর ইয়ট ছিল এককালে, ধ্বংস হয়ে গেছে এখন। কয়েকদিন পরেই দুটো মোহর পেয়েছি আরেক জায়গায়। মনে হয় ওখানে আরও...'

জোরে গাল দিয়ে উঠল কেউ, 'এই হারামজাদা, শুয়োরের বাচ্চা, এখানে কি করছিস!'

চমকে ফিরে তাকাল তিন গোয়েন্দা। বিনয়ী জিম রিভানের এ-কি মূর্তি! রাগে কাঁপছে। চোখ মুখ লাল। ছুটে আসছে। বেকায়দা ভঙ্গিতে পাশে ঝুলছে অকেজো হাতটা। 'হারামজাদা!' আবার গাল দিয়ে উঠল সে। 'একবার না বলেছি, এদিক মাড়াবি না। আজ অ্যায়সা ধোলাই দেব...' থেমে গেল সে।

জিমের দৃষ্টি অনুসরণ করে ফিরে তাকাল তিন গোয়েন্দা। তাদের পাশে নেই পাপালো। ছায়ার মত নিঃশব্দে উঠে চলে গেছে ওখান থেকে।

# সাত

'চোরটা কি চায়?' ভারি গলায় জিজ্ঞেস করল জিম। 'তোমাদেরকে এখানে নিয়ে এসেছে কেন?'

'কিছুই চায় না,' গম্ভীর হয়ে বলল কিশোর। 'ও আনেনি আমাদেরকে, নিজেরাই এসেছি। গুহাটা দেখতে।'

কিশোরের দিকে চাইল একবার জিম। নরম হল গলার স্বর, 'ছেলেটা ভাল না। পাকা চোর, হাতেনাতে কেউ ধরতে পারেনি আজ পর্যন্ত। ওর কাছ থেকে দূরে থাকার পরামর্শই দেব আমি। এখন এসো। জোসেফ গ্র্যাহাম ফিরে এসেছে। তোমাদেরকে যেতে বলেছে।'

ক্যাম্পের দিকে রওনা হল ওরা। রাগ পড়ে গেছে জিমের, অন্তরঙ্গ হয়ে উঠছে ছেলেদের সঙ্গে।

'গুহায় কেন গিয়েছিলে?' এক সময় জিজ্ঞেস করল জিম। 'গুপ্তধন খুঁজতে? কিচ্ছু নেই। সাগরের তলায় ছড়িয়ে গেছে মোহর। কোনদিনই আর পাওয়া যাবে না। তন্ন তন্ন করে খুঁজেছে লোকে, পায়নি। কচিত কখনও এক-আধটা মোহর সৈকতে পড়ে থাকতে দেখা যেত আগে। আজকাল আর তা-ও দেখা যায় না।' হাসল গার্ড। 'সাগরদেবতা কোন জিনিস নিলে আর ফেরত দেয় না। এই তো, বছর দুই আগে, দশ লাখ ডলার নিল...'

'দশ লাখ ডলার!' ভুরু কুঁচকে গেছে কিশোরের।

'হ্যাঁ,' অকেজো বাঁ হাত দেখিয়ে বলল জিম। 'ওই টাকার জন্যেই আমার হাতটা গেল...'

কৌতূহলী হয়ে পড়ল তিন গোয়েন্দা। কাহিনীটা শোনাতে অনুরোধ করল জিমকে।

'এক পরিবহন কোম্পানিতে চাকরি করতাম সে সময়,' বলল জিম। 'টাকা-পয়সা কিংবা মূল্যবান জিনিসপত্র এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় পৌঁছে দেয়ার দায়িত্ব নিত কোম্পানি। আমি ছিলাম একটা আর্মার কারের গার্ড। ব্যাংক থেকে টাকা নিয়ে পৌঁছে দিতে হত বিভিন্ন জায়গায়। কিছু নিয়মিত কাজ ছিল। তার মধ্যে একটাঃ প্রাইভেট ব্যাংক থেকে টাকা তুলে নিয়ে মেলভিলের ন্যাশনাল ব্যাংকে জমা দিয়ে আসা। দিয়ে আসতাম। ঠিকঠাকমতই চলছিল সব। নির্দিষ্ট কোন একটা পথে চলাচল করতাম না আমরা। আজ এ পথে গেলে পরের বার অন্য পথে, তারপরের বার আরেক পথে। নির্দিষ্ট কোন সময়ও মেনে চলতাম না। ডাকাত লুটেরাকে ফাঁকি দেবার জন্যেই এই সাবধানতা। কিন্তু তারপরেও একদিন ঘটে গেল অঘটন...'

জিমের কথা থেকে জানা গেল, ঘটনার দিন, ফিশিংপোর্টের এক ব্যাংক থেকে টাকা নিয়ে মেলভিলে চলেছিল আর্মার কার। গাড়িতে দু'জন লোক। ড্রাইভার আর জিম। পথে এক জায়গায় গাড়ি থামিয়ে দুপুরের খাবার খেতে নামল দু'জনে। গাড়িটা পথের পাশে পার্ক করে তালা লাগাল সিন্দুকে। তারপর ঢুকল রেস্টুরেন্টে। বসল গিয়ে জানালার কাছে, ওখান থেকে পরিষ্কার দেখা যাচ্ছিল গাড়িটা।

খাওয়া শেষ করে বেরোলো দু'জনে। হঠাৎ পাশের একটা পুরানো সিডান গাড়ি থেকে বেরিয়ে এল মুখোসপরা দু'জন লোক। হাতে রিভলভার। ড্রাইভারের পায়ে গুলি করল একজন। আরেকজন বাড়ি মারল জিমের কাঁধে, মাথায়। সঙ্গে সঙ্গে বেহুঁশ হয়ে পড়ল জিম।

গার্ডের পকেট থেকে সিন্দুকের চাবি বের করে নিল ডাকাতেরা। আর্মার কারে উঠে বসল। গুলির শব্দ কানে গিয়েছিল একজন কনস্টেবলের। ছুটে এল সে। গুলি করল দুই ডাকাতকে লক্ষ্য করে। একজনের হাতে গুলি লাগল। গাড়ি নিয়ে পালিয়ে গেল ডাকাতেরা।

পুলিশ স্টেশনে ফোন করে দিল কনস্টেবল। সাড়া পড়ে গেল। রোড ব্লক করে দিল পুলিশ। কড়া পাহারা বসে গেল রাস্তায় রাস্তায়।

সাঁঝের একটু পরে পাওয়া গেল গাড়িটা, রক্তাক্ত। খালি। একটা পরিত্যক্ত বোট হাউসের কয়েক মাইল দূরে। বোঝা গেল, জলপথে পালিয়েছে ডাকাতেরা।

মাঝরাতে কোস্ট গার্ডদের পেট্রল বোট একটা সাধারণ বোটকে ভাসতে দেখল উপসাগরে, কঙ্কাল দ্বীপের কাছাকাছি। বোটের একজন কি যেন ফেলছে পানিতে। তাড়াতাড়ি কাছে চলে এল কোস্ট গার্ডের বোট। দু'জন লোক অন্য বোটটাতে। দুই

ভাই, ভিক এবং বাড ফিশার। দু'জনেই খুব ক্লান্ত, হাল ছেড়ে দিয়েছে। বাডের বাহুতে গুলির ক্ষত, রক্ত ঝরছে! লুট করা টাকার একটি নোটও পাওয়া গেল না বোটে।

'ব্যাপারটা বুঝেছ তো?' বলল জিম। 'নোটের বাণ্ডিল পানিতে ফেলে দিয়েছিল দুই ডাকাত। অনেক খোঁজাখুঁজি করা হয়েছে পরে, কিন্তু একটা নোটও আর পাওয়া যায়নি। পানিতে ভিজে নিশ্চয় গলে-ছিঁড়ে গিয়েছিল কাগজের নোট।'

'মহা-হারামী তো ব্যাটারা।' বলে উঠল মুসা। 'ধরা পড়ল বটে, কিন্তু টাকা ফেরত দিল না। তা ব্যাটাদের জেল হয়েছিল তো?'

'হয়েছিল,' জবাব দিল গার্ড। 'হোভারসনের রিভলভারের বুলেটে আহত হয়েছে বাড। কিন্তু বমাল ধরা যায়নি, তাই মাত্র চার বছর করে জেল হয়ে গেল দুই ভাইয়ের। জেলখানায় ভাল ব্যবহারের জন্যে অর্ধেক শাস্তি মওকুফ করে দেয়া হ ই ওদের। ছাড়া পেয়েছে হপ্তা দুয়েক আগে। কিন্তু আমার হাত আর ফিরে পেলাম না,' জিমের কণ্ঠে ক্ষোভ। 'কাজও গেল কোম্পানি থেকে। এরপর আর ভাল কোন কাজ পাইনি আজ পর্যন্ত। ইচ্ছে করে, ব্যাটাদেরও হাত ভেঙে দিই...'

মুসার বাবা দাঁড়িয়ে আছেন জেটিতে। মোটর বোটে ডুবুরির পোশাক আর অন্যান্য যন্ত্রপাতি তুলছে জোসেফ গ্র্যাহাম।

'এই যে,' তিন গোয়েন্দাকে দেখে বলে উঠলেন মিস্টার আমান। 'যাও, বোটে উঠে পড়। চোখ বুজে নির্ভর করতে পার জোসেফের ওপর। খুব ভাল ডুবুরি।'

ছেলেদেরকে বোটে তুলে দিয়ে চলে গেলেন মুসার বাবা।

বোট ছাড়ল জোসেফ গ্র্যাহাম। বেশ বড়সড় বোট। এক জায়গায় স্তূপ করে রাখা ডুবুরির সাজ-সরঞ্জাম। ওগুলো দেখিয়ে বলল জোসেফ, 'আধুনিক জিনিস। খুব ভাল। তো, ডুবুরির কাজ কেমন জান-টান?'

মুসা জানাল, প্রাথমিক পরীক্ষায় পাশ করেছে ওরা। সুরকেল ব্যবহার করতে জানে ভালই।

'গুড,' খুশি হয়ে বলল জোসেফ। 'এ-বি-সি-ডি থেকে আর শুরু করতে হল না।'

দ্রুত এগিয়ে চলেছে বোট। হলুদ একটা বয়ার কাছে এসে থামিয়ে দিল জোসেফ। নোঙর ফেলল। বলল, 'আমাদের নিচে একটা ভাঙা জাহাজ আছে। না না, কোন গুপ্তধন নেই। ডুবে যাওয়া বেশ কয়েকটা জাহাজ আছে এদিককার পানিতে। সব ক'টাই তন্ন তন্ন করে খুঁজেছে ডুবুরিরা। আমাদের নিচে আছে একটা স্প্যানিশ ইয়ট, অনেক বছর আগে ডুবেছে। এখানে মাত্র পঁচিশ ফুট গভীর পানি। নিশ্চিন্তে ডুব দিতে পার। ডিকম্প্রেশনের ভয় নেই।'

ফেস মাস্ক আর ফ্লিপার পরে নিল ছেলেরা। টেনেটুনে পরীক্ষা করে দেখল জোসেফ। ঠিকমতই পরা হয়েছে। একটা আলমারি খুলে গ্যাস ট্যাংক, হোস

কানেকশন আর ভারি ডাইভিং বেল্ট বের করল সে। বলল, 'এখানকার পানি খুব ভাল। পরিষ্কার, গরম। ওয়েটসুট পরার দরকার নেই। রবিন, প্রথমে তুমি চল আমার সঙ্গে। সব সময় কাছাকাছি থাকবে, আলাদা হবে না মুহূর্তের জন্যেও। বুঝেছ?'

মাথা কাত করে সায় দিল রবিন।

গ্যাস ট্যাংক, বেল্ট বাড়িয়ে দিল জোসেফ। 'এগুলো পরে নাও।'

পরে নিতে লাগল রবিন। তীক্ষ্ণ চোখে তার দিকে চেয়ে রইল জোসেফ। নাহ্, পরতে জানে ছেলেটা। ভালই শিক্ষা দিয়েছে ইনস্ট্রাকটর, ভাবল সে।

বোটের পাশ থেকে ঝুলে আছে দড়ির সিঁড়ি। সিঁড়ি বেয়ে পানিতে নামল জোসেফ। সাগরের দিকে পিঠ দিয়ে হাত ছেড়ে দিল সিঁড়ি থেকে। ঝুপ করে পড়ল চিত হয়ে। ডুবে গেল। তার পর পরই একই কায়দায় ডুবল রবিন।

ফ্লিপার নেড়ে দ্রুত ডুবে চলল। জোড়া লেগে গেছে পায়ের ভাঙা হাড়। কোন অসুবিধে হচ্ছে না সাঁতরাতে। কুসুম গরম পানি। স্বচ্ছ। খুব ভাল লাগছে তার।

নতুন এক পৃথিবীতে এসে প্রবেশ করেছে যেন। নিচে একটা বিশাল কালো ছায়া! ডুবে যাওয়া ইয়ট। জোসেফের পাশাপাশি জাহাজটার দিকে নেমে চলল রবিন।

কাত হয়ে পড়ে আছে ইয়ট। সামনের দিকে বিরাট এক ফাটল হাঁ করে আছে। আরও কাছে গিয়ে দেখা গেল, শ্যাওলায় ঢেকে আছে জাহাজের গা। আশপাশে সাঁতরে বেড়াচ্ছে ছোট ছোট মাছ।

রবিনের আগে আগে সাঁতরাচ্ছে এখন জোসেফ। ফ্লিপার নেড়ে চলে গেল জাহাজের ওপর দিয়ে, পেছন দিকে।

দুটো বড় গলদা চিংড়ির ওপর নজর আটকে গেল রবিনের। আরও কাছ থেকে দেখার জন্যে এগিয়ে গেল। হঠাৎ জোরে ঝাঁকুনি লাগল পায়ে। থেমে যেতে হল।

কিছু একটা শক্ত করে চেপে ধরেছে তার ডান পা।

# আট

পানির তলায় এই প্রথম বিপদে পড়ল রবিন। আতঙ্কিত হয়ে পড়ল। জোরে লাথি মেরে পা ছাড়ানর চেষ্টা করল। পারল না। চাপ বাড়ল পায়ে। পেছনে টানছে।

পেছন ফিরে চাইতে গেল রবিন। ফেস মাস্কে হাত লেগে গেল নিজের অজান্তেই। সঙ্গে সঙ্গে যেন অন্ধ হয়ে গেল সে, সামনের কিছুই দেখা যাচ্ছে না। পানি ঢুকে পড়েছে মাস্কের ভেতর। উত্তেজনায় ভুলে গেল, কি করে পানি বের করে দিতে হয়।

হঠাৎ কাঁধ চেপে ধরল কেউ। চমকে উঠল রবিন। ধরেই নিল, দানবটা এবার

শেষ করতে এসেছে তাকে। কিন্তু না, পিঠের ট্যাংকে তিন বার আলতো টোকা পড়ল। জোসেফ ফিরে এসেছে তাকে উদ্ধার করতে।

শান্ত হয়ে এল রবিন। উত্তেজনা আর আতঙ্ক চলে গেল। মনে পড়ল, কি করে পানি বের করে দিতে হয়।

মাথা ডানে ঘোরাল রবিন। আস্তে করে এক আঙুলে চাপ দিল মাস্কের বাঁ পাশে। সামান্য ফাঁক হল মাস্ক। জোরে শ্বাস ফেলল সে। বুদবুদ তুলে বেরিয়ে গেল বাতাস, সঙ্গে নিয়ে গেল মাস্কের ভেতরের পানি। আঙুল সরিয়ে আনতেই আবার জায়গামত বসে গেল মাস্ক। অন্ধকার সরে গেল চোখের সামনে থেকে।

প্রথমেই জোসেফের ওপর চোখ পড়ল রবিনের। এদিক ওদিক মাথা নাড়ছে লোকটা। আঙুল তুলে পেছনে দেখাল। ফিরে চাইল রবিন। হায় হায়, এর জন্যেই এত ভয় পেয়েছে সে! জাহাজের একটা দড়ি পেঁচিয়ে গেছে তার পায়ে।

বাঁকা হয়ে দড়ি ধরল রবিন। খুলে ফেলল পা থেকে। নিজের ওপরই রাগ হচ্ছে। অযথা আতঙ্কিত হয়ে পড়েছিল। কয়েক ফুট দূরে সরে গেছে জোসেফ। হয়ত এখুনি ওঠার ইঙ্গিত করবে।

কিন্তু না, উঠল না জোসেফ। ডান হাতের বুড়ো আঙুল আর তর্জনীর মাথা এক করে একটা রিং তৈরি করল। দেখাল রবিনকে। তার মানে, সব কিছু ঠিকঠাকই আছে। পাশে চলে এল রবিন। দু'জনে সাঁতরে চলল আবার।

পুরো জাহাজের সামনে থেকে পেছনে একবার সাঁতরাল ওরা। তারপর চারদিকে এক চক্কর দিল। আশপাশে ঘোরাফেরা করছে ছোট ছোট মাছ। ভয় পাচ্ছে না। দু'জন সাঁতারুকে বড় জাতের কোন মাছ মনে করছে হয়ত।

অসংখ্য গলদা চিংড়ি দেখতে পেল রবিন। ইস, একটা স্পীয়ার গান যদি থাকত সঙ্গে! কয়েকটাকে ধরে নিয়ে যাওয়া যেত।'

আরও কিছুক্ষণ সাঁতরাল ওরা। তারপর ওপরে ওঠার ইঙ্গিত করল জোসেফ।

ধীরে ধীরে ওপরের দিকে উঠতে লাগল দু'জনে, কোনরকম তাড়াহুড়ো করল না। মোটর বোটের তলা দেখা যাচ্ছে, অদ্ভুত কোন দানব যেন। ভুস্‌স্‌ করে পানির ওপর মাথা তুলল দু'জনে।

দড়ির সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠে গেল জোসেফ। তাকে অনুসরণ করল রবিন।

'কেমন লাগল?' আগ্রহী গলায় বলল মুসা। হাত ধরে রবিনকে বোটে উঠতে সাহায্য করল।

'ভালই লাগত, কিন্তু গুবলেট করে ফেলেছি,' বলল রবিন। 'দড়ি পেঁচিয়ে গিয়েছিল পায়ে। মাথা ঠিক রাখতে পারিনি।'

জোসেফও জানাল, কিছু কিছু ভুল করেছে রবিন। পানির তলায় কোন কারণেই আতঙ্কিত হয়ে পড়া চলবে না, এর ওপর ছোটখাট এক বক্তৃতা দিল। বলল, এরপর ইয়টের কাছ থেকে দূরে থাকতে হবে।

'মন খারাপ করার কিছু নেই,' হেসে বলল জোসেফ। পানির তলায় হঠাৎ কোন বিপদে পড়ে গেলে মাথা ঠিক রাখা সত্যি কঠিন। রবিনের কপাল ভাল, দড়িতে আটকেছে পা। অক্টোপাসের কবলে পড়েনি। তবে, অক্টোপাস কিংবা হাঙর আক্রমণ করে বসলেও মাথা ঠাণ্ডা রাখতে হবে। না না, চমকে ওঠার কিছুই নেই। এদিককার পানিতে ওই দুটো জীব দেখা যায় না খুব একটা। হ্যাঁ, এবার মুসার পালা।'

তাড়াতাড়ি তৈরি হয়ে নিল মুসা।

দড়ির সিঁড়ি বেয়ে নেমে গেল দুই ডাইভার। পানির তলায় ডুবে গেল মাথা।

কি কি ঘটেছে পানির তলায়, কিশোরকে খুলে বলল রবিন। শেষে বলল, 'পরের বার আর এমন ভুল...'

একটা ডাক শুনে থেমে গেল রবিন। চাইল। একশো গজ দূরে ছোট একটা পালের নৌকা। নিঃশব্দে এগিয়ে আসছে। হাত নেড়ে তাদের ডাকছে পাপালো।

দেখতে দেখতে কাছে চলে এল নৌকা। দ্রুত অভ্যস্ত হাতে পাল নামিয়ে ফেলল পাপালো। হাসল। ঝকঝক করে উঠল সাদা দাঁত।

'আমার সম্পর্কে নিশ্চয় অনেক খারাপ কথা বলেছে জিম,' বলল পাপালো। 'বিশ্বাস করেছ তো?'

'না, বলল রবিন। 'বিশ্বাস করিনি। তোমার সম্পর্কে কোনরকম খারাপ ধারণা আমাদের নেই।'

'খুব খুশি হলাম,' হাসল আবার পাপালো। বোটের গায়ে হাত ঠেকিয়ে নৌকা থামাল।

বোটে ফেলে রাখা ডুবুরির-সরঞ্জামগুলোর দিকে চাইল একবার সে, চকচক করছে চোখ। গলার স্বর নির্লিপ্ত রেখে বলল, 'ইয়টটার কাছে যেতে এত সাজসরঞ্জাম লাগে না। পানি খুবই অল্প। কোন যন্ত্রপাতি ছাড়াই যেতে পারি আমি ওখানে।'

'শুনেছি, গ্রীক স্পঞ্জ শিকারিরা যন্ত্রপাতি ছাড়াই একশো ফুটের বেশি পানির তলায় ডুব দিতে পারে,' বলল রবিন।

'ঠিকই শুনেছ,' গর্বিত স্বরে বলল পাপালো। 'আমার বাপ দুশো ফুট নিচে চলে যেতে পারত। কোমরে একটা দড়ি বাঁধা থাকত শুধু, টেনে তোলার জন্যে। দম রাখতে পারত তিন মিনিট।' মেঘ ঘনিয়ে এল তার চেহারায়। 'কিন্তু অসুস্থ হয়ে পড়েছে বাবা। আর কোনদিন ডুব দিতে পারবে না। প্রায়ই বলে, আবার গ্রীসে ফিরে যেতে ইচ্ছে করে তার। কিন্তু টাকা কোথায়? যদি কোনদিন গুপ্তধন পেয়ে যাই, বাবাকে নিয়ে দেশে চলে যাব আমি। একটা মোটরবোট কিনব। মাছ ধরব সাগরে। আহা, ওখানকার জেলেদের জীবন কত সুন্দর!' আবার হাসি ফিরল পাপালোর চেহারায়। দ্বিধা করল এক মুহূর্ত। তারপর বলল, 'আগামীকাল গুপ্তধন

খুঁজতে যাব। আমার সঙ্গে যাবে তোমরা?'

'নিশ্চয়!' প্রায় চেঁচিয়ে উঠল রবিন। 'খুব মজা হবে!'

এতক্ষণ চুপচাপ কথা শুনছিল কিশোর। বলল, 'শুধু গুপ্তধন খুঁজলে, আর সাঁতার কেটে বেড়ালে তো চলবে না আমাদের। যে কাজে এসেছি, তা-ও কিছু করার দরকার।' তারপর দু'জনকেই অবাক করে দিয়ে জোরে 'হ্যা-চ্-চোহ্!' করে উঠল সে।

'ঠাণ্ডা লাগল নাকি তোমার?' গোয়েন্দাপ্রধানের দিকে চেয়ে বলল রবিন।

কিশোর কোন জবাব দেয়ার আগেই বলে উঠল পাপালো, 'খবরদার, ঠাণ্ডা লাগলে ডুব দিতে যেয়ো না! ভীষণ কানব্যথা করবে। আচ্ছা, চলি এখন। কাজ আছে। কাল দেখা হবে।'

আবার পাল তুলে দিল পাপালো। চলতে শুরু করল নৌকা। রোদে চকচক করছে উপসাগরের পানি। তাতে ভর করে উড়ে চলল যেন হালকা পালের নৌকা।

কয়েক মিনিট পর। পানির ওপর মাথা তুলল মুসা আর জোসেফ। বোটে উঠে এল।

ফেস মাস্ক খুলে ফেলল মুসা। হাসল। 'দারুণ! কিশোর, এবার তোমার পালা।'

খুব একটা আগ্রহী মনে হল না কিশোরকে। শরীর ভাল লাগছে না। পিঠে ট্যাংক বেঁধে মাস্কটা টেনে নামাল মুখের ওপর। জোসেফের পিছু পিছু পানিতে নেমে গেল সিঁড়ি বেয়ে।

'রবিন!' উত্তেজিত মনে হল মুসাকে। 'জান, কি দেখেছি?'

'কি?'

কিছু একটা দেখেছি! ইয়টের ফুট পঞ্চাশেক তফাতে। উঠে আসছি তখন। বালিতে পড়ে আছে, চকচকে! আমার মনে হয় মোহর! আবার যখন ডুব দেব, দেখে আসব ওটা।'

'তুমি শিওর?'

'ঠিক শিওর না। তবে চকচকে কিছু একটা দেখেছি, এটা ভুল নয়। এখানকার লোকে তো বলেই, উপসাগরের তলায় ছড়িয়ে গেছে মোহর। মাঝে মধ্যে পাওয়াও যায়।'

কিছু একটা বলতে গিয়েও থেমে গেল রবিন। ভেসে উঠেছে কিশোরের মাথা। তার পাশেই জোসেফ। কিশোরের ফেস মাস্ক সরে গেছে একপাশে। তাকে ধরে রেখেছে জোসেফ। ঠেলে দিচ্ছে বোটের দিকে।

'কি হয়েছে?' জিজ্ঞেস করল রবিন।

'তেমন কিছু না,' অভয় দিয়ে বলল জোসেফ। 'কি করে জানি মাস্ক সরে গেল ওর। ভাগ্য ভাল, গভীর পানিতে ছিল না!'

বোটে উঠে এল দু'জনে।

বিধ্বস্ত দেখাচ্ছে কিশোরের চেহারা। মাস্ক খুলে রাখতে রাখতে বলল, 'কান ব্যথা করছিল। হাঁচি পেল হঠাৎ। আটকাতে পারলাম না। মাস্ক সরে গেল। পানি ঢুকে গেল মুখে। মাস্ক আর জায়গামত সরাতে পারলাম না।'

আবার হাঁচি দিল কিশোর।

'ঠাণ্ডা লেগেছে,' বলল জোসেফ। 'আজ আর ডুব দিতে পারবে না। আগামী তিন-চার দিনেও পারবে বলে মনে হয় না।'

'আমারও তাই মনে হচ্ছে,' সায় দিয়ে বলল কিশোর। 'গতকাল প্লেনে এয়ারকুলারের বাতাস একটু বেশি ঠাণ্ডা ছিল। তার ওপর রাতে বৃষ্টিতে ভিজেছি। ঠাণ্ডা ধরে ফেলেছে।'

'পুরোপুরি সুস্থ না হয়ে আর ডুবতে এসো না,' পরামর্শ দিল জোসেফ। 'হাঁচি কিংবা কাশি থাকলে তো নয়ই। ঠিক আছে, তুমি বস। মুসা আর রবিনকে ঘুরিয়ে আনি কয়েকবার। নাকি তোমরাও আর যেতে চাও না?'

'না না, যেতে চাইব না কেন?' বলে উঠল মুসা।

পালা করে ডুব দিতে লাগল মুসা আর রবিন। প্রথমবারের চেয়ে বেশিক্ষণ ডুবে থাকে এখন। চকচকে জিনিসটা আবার দেখা যায় কিনা, সেদিকে নজর রাখল দু'জনেই। কিন্তু দেখতে পেল না আর।

বিকেল হয়ে গেল। আর কোনরকম বিপদ ঘটল না। সেদিনকার মত ডোবার কাজে ইস্তফা দেবার সিদ্ধান্ত নিল জোসেফ। একা একা একবার ডুব দেবার অনুমতি চাইল মুসা। কি ভেবে রাজি হয়ে গেল তাদের ইনস্ট্রাক্টর।

অনেকক্ষণ পরে, শঙ্কিত হয়ে পড়েছে জোসেফ, এই সময় ভেসে উঠল মুসার মাথা। বোটে এসে উঠল। এক হাতে মুঠো করে রেখেছে কি-যেন।

ফেস মাস্ক খুলে ফেলল মুসা। 'দেখ!'

মুসার খোলা মুঠোর দিকে চাইল তিনজনে। একটা উজ্জ্বল বড় মুদ্রা। ধারগুলো ক্ষয়ে গেছে।

'এ-কি!' চেঁচিয়ে উঠল জোসেফ। চোখ বড় বড় হয়ে গেছে। 'ডাবলুন!' মুসার হাত থেকে মোহরটা তুলে নিয়ে দেখল ভাল করে। 'সতেরোশো বারো সালের। স্প্যানিশ। মুসা, খবরদার এটার কথা কাউকে বোলো না!'

'কেন?' অবাক হল মুসা। 'ছিনিয়ে নেবে?'

'না, তা নেবে না। তবে শয়ে শয়ে লোক চলে আসবে গুপ্তধন খুঁজতে। বারোটা বাজিয়ে ছাড়বে আমাদের শূটিঙের।'

## নয়

সে রাতে সকাল সকাল শুতে যাবার জন্যে তৈরি হল তিন কিশোর।

সারাদিন ডোবাডুবি করেছে, ভীষণ ক্লান্ত মুসা আর রবিন। চোখ জড়িয়ে আসছে ঘুমে।

কিশোরের অসুখ আরও বেড়েছে। নাক দিয়ে পানি গড়াচ্ছে। হাঁচি দিয়ে চলেছে একের পর এক।

মিসেস ওয়েলটনের বোর্ডিং হাউসে ছেলেদের সঙ্গেই রাতের খাবার খেয়েছেন মিস্টার আমান। এখন ফিরে যাবেন কঙ্কাল দ্বীপে। অনেক কাজ পড়ে আছে।

'নাগরদোলার ভুতের গল্প সারা শহরে ছড়িয়ে পড়েছে,' ঝাঁঝালো কণ্ঠে বললেন মুসার বাবা। 'জিম শহরে গিয়ে বলে এসেছে গতরাতে সে-ই নাগরদোলা ঘুরিয়েছিল, কিন্তু কেউ বিশ্বাস করতে চায় না। গার্ড জোগাড় করতে পারেনি। কাজের লোকও আসেনি। দেখি, যাই, যদি কাঠমিস্ত্রি জোগাড় করতে পারি...'

বেরিয়ে গেলেন মিস্টার আমান।

নিজেদের ঘরে এসে ঢুকল ছেলেরা। ঘুরিয়ে ফিরিয়ে কয়েকবার দেখা হয়ে গেছে মোহরটা, আরেকবার বের করল ওটা মুসা। হাতে নিয়ে ওজন আন্দাজ করল, আঙুল দিয়ে ছুঁয়ে ধারগুলো পরীক্ষা করল, লেখাগুলো দেখল। কোথায় রাখবে? জামার পকেটে? না, পড়ে যেতে পারে—ভাবল সে। রেখে দিল নিজের বালিশের তলায়। বিছানায় উঠে শুয়ে পড়ল। রবিন আর কিশোর আগেই শুয়ে পড়েছে।

সকালে মিসেস ওয়েলটনের ডাকে ঘুম ভাঙল তিন গোয়েন্দার।

'ওঠ, ছেলেরা!' দরজার বাইরে থেকে ডাকছে বাড়িওয়ালি। 'নাস্তা তৈরি। মুসা, তোমার বাবা এসেছেন। জলদি এসো!'

তাড়াহুড়ো করে তৈরি হয়ে নিল তিন কিশোর। নেমে এল একতলায়।

মিস্টার আমান বসে আছেন। ছেলেদেরকে দেখে বললেন, 'এই যে, এসেছ। একটা কথা বলতে এসেছি। আজ তোমাদের ব্যবস্থা তোমাদেরকেই করে নিতে হবে। আমি খুব ব্যস্ত থাকব। জোসেফও সঙ্গে যেতে পারবে না। কোথাও যেতে চাইলে, নিজেরাই যাও। কিশোর, তোমার শরীর কেমন এখন?'

'ভাল না,' বলল কিশোর। ভীষণ জোরে হ্যাঁচচো করে উঠল। রুমাল দিয়ে নাক মুছতে মুছতে বলল, 'সরি! চেপে রাখতে পারিনি!'

'হুম্‌ম্‌!' গম্ভীর হয়ে মাথা ঝোঁকালেন মিস্টার আমান। 'সত্যি খারাপ! তুমি ওদের সঙ্গে বেরিও না। ঘরেই থাক দু-এক দিন। ডক্টর রোজারকে ফোন করে দিচ্ছি। খুব ভাল লোক। আমার বন্ধু। স্কেলিটন দ্বীপের মালিক। গিয়ে দেখিয়ে এসো ওকে।'

বসে পড়ল ছেলেরা। নাস্তা দিয়ে গেল মিসেস ওয়েলটন।

ফোনের কাছে উঠে গেলেন মিস্টার আমান। ফিরে এসে জানালেন, দুপুর নাগাদ কয়েক মিনিটের জন্যে সময় দিতে পারবেন ডাক্তার রোজার। একটা কাগজে ডাক্তারের নাম-ঠিকানা লিখে দিয়ে বেরিয়ে গেলেন।

'ব্যাপারটা খুব খারাপ হয়ে গেল, কিশোর,' বলল মুসা। 'তুমি বেরোতে পারবে না। ভাবছিলাম, মোটর বোটটা নিয়ে আমরা একাই যাব।'

'কি আর করব! যাকগে, ভালই হল, ভাবার সুযোগ পেলাম,' বলল কিশোর। নিজের জন্যে করুণা হচ্ছে তার, কিন্তু প্রকাশ করতে চায় না। 'অনেক কিছু ভাবার আছে। কঙ্কাল দ্বীপের কথাই ধর না, কিছু একটা রহস্য রয়েছে ওটার। কিন্তু কি, বুঝতে পারছি না!'

'কি রহস্যের কথা বলছ?' জিজ্ঞেস করল মিসেস ওয়েলটন। বড় এক প্লেট কেক নিয়ে ফিরে এসেছে।

'স্কেলিটন আইল্যাণ্ড।'

'স্কেলিটন আইল্যাণ্ড? ওই ভয়ানক জায়গাটা! জান, পরশু রাতেও নাগরদোলায় চড়েছে স্যালি ফ্যারিংটনের ভূত?'

'জানি,' শান্ত গলায় জবাব দিল কিশোর। 'আসলে কি ঘটেছিল, তা-ও জানি। ভূত-ফুত কিচ্ছু না।' ব্যাপারটা খুলে বলল মিসেস ওয়েলটনকে।

'তা হতে পারে!' বিশ্বাস করতে পারছে না মিসেস ওয়েলটন। 'তবু, সবাই বলে, ওখানে ভূতের উপদ্রব আছে। এত ধোঁয়া, তলায় নিশ্চয় আগুন আছে!'

আবার বেরিয়ে গেল বাড়িওয়ালি।

নাক দিয়ে অদ্ভুত একটা শব্দ করল কিশোর। 'এতেই বোঝা যায়, লোকের বিশ্বাস ভাঙানো কত কঠিন!'

জানালায় টোকার শব্দ হল। একই সঙ্গে সেদিকে ঘুরে গেল তিন জোড়া চোখ। রোদে পোড়া একটা মুখ। উজ্জ্বল কালো এক জোড়া চোখ চেয়ে আছে ওদের দিকে। পাপালো হারকুস।

'পাপু!' চাপা গলায় বলে উঠল রবিন। উঠে দ্রুত এগিয়ে গেল জানালার দিকে।

'গুপ্তধন খুঁজতে যাচ্ছি,' ফিসফিস করে বলল পাপালো। 'তোমরা যাবে?'

'নিশ্চয়! তবে আমি আর মুসা। কিশোর যেতে পারছে না।'

'ঠাণ্ডা আরও বেড়েছে না? থাকুক, কি আর করা! যাচ্ছি। জেটির পাশে থাকব। ডুবুরির সাজসরঞ্জাম নিয়ে এসো।'

চলে গেল পাপালো।

ফিরে এল রবিন। পাপালোর সঙ্গে কি কথা হয়েছে জানাল দুই বন্ধুকে।

'দারুণ!' উজ্জ্বল হয়ে উঠল মুসার মুখ। 'হয়ত আরেকটা মোহর খুঁজে পাব!

চল, তাড়াতাড়ি তৈরি হয়ে বেরিয়ে পড়ি।'

'যাচ্ছি,' বলল রবিন। 'কিশোর যেতে পারছে না, সত্যি খুব খারাপ লাগছে।'

কিশোরের চেহারা দেখেই বোঝা যাচ্ছে, তারও খুব খারাপ লাগছে। কিন্তু মুখে প্রকাশ করল না সেকথা। 'আমি পারছি না, তাতে কি? তোমরা যাও। অসুখের সঙ্গে তো আর কথা নেই।'

'লাঞ্চের সময় ফিরে আসব আমরা,' বেরিয়ে গেল মুসা। পেছনে রবিন। দ্রুত জেটির দিকে এগিয়ে চলেছে দু'জনে।

পুরানো ভাঙাচোরা জেটির পাশে নৌকা নিয়ে অপেক্ষা করছে পাপালো। দুই বন্ধুকে দেখেই হাত তুলে ডাকল।

নৌকায় উঠল দুই গোয়েন্দা। নৌকা ছাড়ল পাপালো। গুপ্তধনের খোঁজে চলল তিন কিশোর।

বন্ধুদেরকে বেরিয়ে যেতে দেখল কিশোর। দীর্ঘশ্বাস ফেলল। চেয়ার ঠেলে সরিয়ে উঠে দাঁড়াল। স্কেলিটন আইল্যাণ্ডের ওপর লেখা ফীচারটা আরেকবার খুঁটিয়ে পড়ার সিদ্ধান্ত নিয়ে শোবার ঘরে এসে ঢুকল।

বিছানা গোছগাছ করছে মিসেস ওয়েলটন। মুসার বালিশটা টান দিয়ে সরিয়েই স্থির হয়ে গেল। চেঁচিয়ে উঠল, 'আরে! সোনার মোহর! এটা এল কোত্থেকে!' ভুরু কুঁচকে তাকাল কিশোরের দিকে। 'তোমরা খুঁজে পেয়েছ, না? স্কেলিটন আইল্যাণ্ডে?'

'মুসা পেয়েছে,' বলল কিশোর। কানে বাজছে জোসেফ গ্র্যাহামের হুঁশিয়ারিঃ খবরদার! কেউ যেন জানতে না পারে! কিন্তু চেপে রাখা গেল না। ফাঁস হয়ে গেল মুসার বোকামির জন্যে।

'স্কেলিটন আইল্যাণ্ডেই পেয়েছে তো?'

'না, উপসাগরে। দ্বীপ থেকে অনেক দূরে।'

'তাজ্জব কাণ্ড! প্রথম দিন পানিতে ডুব দিয়েই মোহর পেয়ে গেল!' কিশোরের দিকে তাকাল মিসেস ওয়েলটন। চোখে সন্দেহ। লোকের ধারণা, শূটিঙ-ফুটিঙ কিছু না, আসলে মোহর খুঁজতে এসেছে দলটা। ক্যাম্প করেছে দ্বীপে। ক্যাপ্টেন ওয়ান ইয়ারের আসল ম্যাপটা পেয়ে গেছে ওরা কোনভাবে।'

'হুঁ,' চিন্তিত ভঙ্গিতে মাথা ঝোঁকাল কিশোর। সেজন্যেই কি বিরক্ত করা হচ্ছে সিনেমা কোম্পানিকে। কেউ হয়ত চাইছে, কোম্পানি দ্বীপ থেকে চলে যাক।...কিন্তু মিসেস ওয়েলটন, সত্যি বলছি, কোন ম্যাপ নেই কোম্পানির কাছে। ওরা গুপ্তধন খুঁজতে আসেনি। ছবি তুলতেই এসেছে। আপনার এখানে অনেকেই আসে, তাদের ভুল বিশ্বাস ভেঙে দেবার চেষ্টা করবেন।'

'তা করব। কিন্তু আমার কথা বিশ্বাস করবে বলে মনে হয় না। একবার কোন

কথা ওদের মাথায় ঢুকলে আর সহজে বেরোতে চায় না।

'হ্যাঁ,' মাথা ঝোঁকাল কিশোর। 'এই যেমন, নাগরদোলার ভূতের কথাও বেরোতে চাইছে না। আচ্ছা, আপনাকে কয়েকটা কথা জিজ্ঞেস করব, জবাব দেবেন? সারাজীবন এখানেই বাস আপনার, এখানকার অনেক কিছুই জানেন।'

'নিশ্চয় বলব, যা জানি,' হাসল মহিলা। 'ঘরটা গুছিয়ে নিই। নিচেও কয়েকটা কাজ আছে। তুমিও নিচেই চলে এসো। কফি খেতে খেতে কথা বলব।'

'ঠিক আছে,' বলল কিশোর। রবিনের ব্যাগ থেকে ম্যাগাজিনটা বের করে নিল। 'আমি যাচ্ছি। আপনি আসুন।' ড্রইংরুমে এসে বলল কিশোর। পড়ায় মন দিল।

কাজ সেরে এল মিসেস ওয়েলটন। হাতে দু'কাপ কফি।

ম্যাগাজিনটা বন্ধ করে পাশে রেখে দিল কিশোর। হাত বাড়িয়ে একটা কাপ তুলে নিল।

আরেকটা সোফায় বসে পড়ল মিসেস ওয়েলটন। 'হ্যাঁ, এবার কি বলতে চাও।'

'ওই স্কেলিটন আইল্যাণ্ড,' বলল কিশোর। 'প্রথমেই বলুন, ওটা ভুতুড়ে হল কি করে?' জানা আছে তার, তবু স্থানীয় একজনের মুখে শুনতে চায়।

খুলে বলল সব মিসেস ওয়েলটন। ফীচারে লেখা তথ্যের সঙ্গে তার কথা হুবহু মিলে গেল। একটা কথা জানা গেল, যেটা লেখা নেই। প্লেজার পার্ক পরিত্যক্ত হবার অনেক বছর পর আবার দেখা দিতে শুরু করেছে স্যালি ফ্যারিংটনের ভূত! বেশ ঘন ঘন দেখা যাচ্ছে ইদানীং।

'জেলেরা, যারা দেখেছে,' বলল কিশোর, 'তাদেরকে কতখানি বিশ্বাস করা যায়?'

'তা সঠিক বলা মুশকিল! তিলকে তাল করার অভ্যাস আছে জেলেদের। তবে ওই তিলটা থাকতেই হবে। আরেকটা ব্যাপার, স্কেলিটন আইল্যাণ্ডে ভূত আছে, শুধু শুধু বানিয়ে বলতে যাবে কেন ওরা?'

কেন বলতে যাবে, কোন ধারণা নেই কিশোরের। তবে, জেলেরা পুরোপুরি মিছে কথা বলেছে, এটাও ঠিক বিশ্বাস হচ্ছে না তার।

'ঠিক ক'বছর আগে থেকে দেখা দিতে শুরু করেছে স্যালি ফ্যারিংটনের ভূত?' জিজ্ঞেস করল কিশোর।

'সঠিক বলতে পারব না,' বলল মিসেস ওয়েলটন। 'তবে বছর দুই-তিন আগে থেকে।' কিশোরের দিকে তাকাল বাড়িওয়ালি। 'সিনেমা কোম্পানি এল, ক্যাম্প করল দ্বীপে। চুরি যেতে লাগল তাদের জিনিসপত্র, কিন্তু চোর ধরা পড়ল না। ভূতে নিয়ে যায় যেন জিনিসপত্রগুলো! একেবারে গায়েব! নাহ, কিছু একটা রহস্য আছে দ্বীপটায়! কি, বলতে পারব না!'

কিশোরও মিসেস ওয়েলটনের সঙ্গে একমত। কিছু একটা রহস্য আছে কঙ্কাল দ্বীপের। কিন্তু কি সে রহস্য!

## দশ

চমৎকার হাওয়া, ফুলে উঠেছে পাল। তরতর করে এগোচ্ছে ছোট নৌকা। আশপাশে কোন নৌকা-জাহাজ নেই। অনেক দূরে দক্ষিণ দিগন্তে কয়েকটা কালো বস্তু, মাছ ধরা নৌকা।

কঙ্কাল দ্বীপের জেটিতে এসে নৌকা বাঁধল পাপ্যালো, রবিন আর মুসার অনুরোধ। ডুবুরির সাজসরঞ্জাম নেবে ওরা। তবে আগে জোসেফ গ্রাহামের কাছ থেকে অনুমতি নিতে হবে।

অনুমতি দিল জোসেফ। তাড়াহুড়ো করে চলে গেল প্লেজার পার্কের দিকে।

মোটর বোটের আলমারি খুলে মুসা বের করল ফ্লিপার, মাস্ক, গ্যাস ট্যাংক। দু'জনের জন্যে। পাপালোর দরকার নেই। ওসব সরঞ্জাম ছাড়াই সাগরে ডুব দিতে অভ্যস্ত সে। কি ভেবে, পানির তলায় ব্যবহারের উপযোগী দুটো টর্চও নিয়ে নিল।

আবার এসে উঠল ওরা নৌকায়। বাঁধন খুলল পাপালো। আবার নৌকা ছাড়ল।

উজ্জ্বল রোদে ঝিকমিক করছে পানি। ছোট ছোট ঢেউয়ে তালে তালে দুলছে নৌকা। চুপ করে বসে থাকতে থাকতে ঝিমুনি এসে গেল দুই গোয়েন্দার।

গান ধরল পাপালো। ভাষাটা বুঝতে পারল না দুই গোয়েন্দা। নিশ্চয় গ্রীক। চোখ মেলে চাইল ওরা। চোখে পড়ল দ্য হ্যাণ্ড, হস্ত। যেখানে দু'রাত আগে রহস্যজনকভাবে আটকা পড়েছিল ওরা।

রাতে ভালমত দেখতে পারেনি, দিনের আলোয় এখন দেখল ওরা দ্বীপটা। সোয়া এক মাইল লম্বা, শ'দুয়েক গজ চওড়া। রুক্ষ, পাথুরে, মানুষ বসবাসের অযোগ্য। ফোয়ারা দেখা যাচ্ছে না এখন, শুধু ঝড়ের সময় দেখা যায়।

ফোয়ারার কথা পাপালোকে জিজ্ঞেস করল রবিন।

'সাগর আজ শান্ত,' বলল পাপালো। 'খুব বেশি অশান্ত হলে তবেই পানি ছিটায় ওই ফোয়ারা।...দ্বীপের তলায় কোন ধরনের সুড়ঙ্গ আছে। ওটা দিয়েই পানি ঢুকে ছিটকে বেরোয় টিলার ওপরের ছিদ্র দিয়ে। তিমির ফোয়ারার মত।'

দ্বীপের মূলভূমির একশো গজ দূরে নৌকা রাখল পাপালো। পাল নামিয়ে নোঙর ফেলল। 'এখন ভাটা। পানি কম এদিকে। পুরো জোয়ারের সময়ই কেবল দ্বীপ পর্যন্ত নৌকা নিয়ে যাওয়া যায়।'

ঢেউয়ে নাচছে নোঙরে-বাঁধা নৌকা। সাজ-সরঞ্জাম পরে নিল রবিন আর মুসা। পাপালোর ওসব দরকার নেই। নিজের ফেস মাস্কটা শুধু পরে নিয়েছে।

আস্তে করে নৌকা থেকে পানিতে পড়ল পাপালো। আগে আগে সাঁতরে

চলল। তাকে অনুসরণ করল দুই গোয়েন্দা।

কয়েক গজ গিয়ে থেমে গেল পাপালো। দাঁড়িয়ে পড়ল। কয়েক ফুট এগিয়েই হাঁটু পানিতে উঠে এল। ফিরে চেয়ে দুই সঙ্গীকে বলল, 'বলেছি না, পানি একেবারে কম। যা চোখা পাথর। খোঁচা লাগলে নৌকা শেষ। এজন্যেই ওখানে রেখে আসতে হয় নৌকা।'

ছপাৎ ছপাৎ আওয়াজ তুলে হেঁটে চলল ওরা। দ্বীপে উঠল। একপাশে একটা ছোট খাঁড়ি। তলায় বালি। বিশ ফুট গভীর। তল দেখা যায়।

'গত হপ্তায় ওই খাঁড়িতেই দুটো মোহর পেয়েছি,' পাপালো বলল। 'কপাল ভাল হলে আজও পেয়ে যেতে পারি কয়েকটা।'

খাঁড়িতে নেমে পড়ল তিন কিশোর। ডুব দিল।

এখানে ওখানে পড়ে আছে ছোটবড় পাথর। পাথর ঘিরে জন্মেছে নানারকম সামুদ্রিক আগাছা। হলদে বালিতে পড়ে আছে উজ্জ্বল রঙের তারা মাছ। আশপাশে ঘুরছে ছোট রঙিন মাছের দল। আর আছে কাঁকড়া। অগুণতি। বিচিত্র ভঙ্গিতে পাশে হেঁটে এগোচ্ছে, তাড়া করলেই সুড়ুৎ করে লুকিয়ে পড়ছে ছোট ছোট গর্তে। অনেক কিছুই দেখল তিন ডুবুরি, কিন্তু একটা মোহরও চোখে পড়ল না।

ওঠার ইশারা করল মুসা। ভুসস করে ভেসে উঠল তিনজনে।

'বেশি গভীর না,' মাউথপিস খুলে নিয়ে বলল মুসা। 'এখানে গ্যাস নষ্ট করে লাভ নেই। এক কাজ করলেই তো পারি। সব কিছু রেখে পাপুর মত শুধু মাস্ক পরে ডুব দিলে অসুবিধে কি? ও পারছে, আমরা পারব না কেন?'

রাজি হল রবিন। তীরে এসে উঠল দু'জনে। মাস্ক ছাড়া আর সব সরঞ্জাম খুলে রাখল পাথরের ওপর। আবার নেমে এল খাঁড়িতে।

পুরো খাঁড়ির কোথাও খোঁজা বাদ রাখল না ওরা। কিন্তু মোহরের চিহ্নও চোখে পড়ল না।

ক্লান্ত হয়ে তীরে এসে উঠল তিনজনে, বিশ্রাম নিতে।

'আজ ভাগ্য বিরূপ,' হতাশ কণ্ঠে বলল পাপালো। 'তবে পেলে কাজ হত। বাবার অসুখ বেড়েছে। চল, আরেক জায়গায় যাই। একটা জায়গা চিনি। অনেক দিন আগে ওখানে একটা মোহর পেয়েছিলাম। ওখানে গিয়ে...' হঠাৎ থেমে গেল সে। চেয়ে আছে উপসাগরের দিকে।

কানে ঢুকল ইঞ্জিনের শব্দ। ফিরে চাইল রবিন। ধূসর একটা মোটর বোট। পুরানো। দ্রুত গতিতে ছুটে আসছে।

'এদিকেই আসছে।' বলল পাপালো। 'ওরাও মোহর খুঁজতে আসছে কিনা কে জানে!'

দ্রুত এগিয়ে আসছে বোট। গতি কমছে না মোটেই। লাফিয়ে উঠে দাঁড়াল পাপালো। 'আরে, পাথরে বাড়ি লাগাবে তো! তলা খসাবে!' চেঁচিয়ে উঠল সে।

'এ-ই-ই! বোট থামাও! বাড়ি লাগবে পাথরে!'

কমল না বোটের গতি। ইঞ্জিনের শব্দে পাপালোর চিৎকার কানে গেল না হয়ত চালকের।

উঠে দাঁড়াল মুসা আর রবিন। তিনজনে হাত নেড়ে নেড়ে চিৎকার করতে লাগল, বোট থামাতে বলল।

আরও এগিয়ে এল বোট। হুইল ধরে রাখা চালককে দেখা যাচ্ছে। মাথার বড় হ্যাটের কাণা টেনে নামানো। চেনা গেল না লোকটাকে। ছেলেদের চিৎকার তার কানে গেল কিনা বোঝা গেল না, তবে হঠাৎ বদলে গেল ইঞ্জিনের শব্দ। গতি কমে গেল বোটের। ব্যাক গীয়ার দিয়েছে হয়ত।

সাঁ করে পাশে ঘুরে গেল বোটের নাক। গতি এখনও অনেক। কাত হয়ে গেল একপাশে, উল্টেই যাবে যেন। সোজা হয়ে গেল আবার। তারপরই ঘটল অঘটন।

বোটের ঠিক সামনেই পাপালোর নৌকা। শেষ মুহূর্তে নৌকাটা দেখতে পেল বোধহয় চালক। সরে যাবার চেষ্টা করল কিনা, বোঝা গেল না। প্রচণ্ড জোরে আঘাত হানল ইস্পাতের তৈরি ভারি বোটের নাক, নৌকার মাঝামাঝি। ঢুকে গেল ভেতরে। একটা মুহূর্ত এক হয়ে রইল দুটো জলযান! জোরে গর্জে উঠল মোটর বোটের ইঞ্জিন। ঝটকা দিয়ে নৌকার ভেতর থেকে বের করে আনল নাক। মোড় ঘুরে সোজা ছুটল খোলা সাগরের দিকে।

বোবা হয়ে গেছে যেন ছেলে তিনটে। হাঁ করে চেয়ে আছে ভাঙা নৌকাটার দিকে। দ্রুত তলিয়ে যাচ্ছে ওটা।

'ইয়াল্লা!' গুঙিয়ে উঠল মুসা। 'কাপড়-চোপড়, ঘড়ি, সব গেল আমাদের!'

'বাড়ি ফেরার পথ বন্ধ!' বিড়বিড় করল রবিন। 'আটকা পড়লাম এই দ্বীপে! দ্বিতীয়বার!'

স্তব্ধ হয়ে গেছে পাপালো। কিছুই বলার নেই তার। মুঠো হয়ে গেছে হাত। বোবা চোখে চেয়ে আছে সাগরের দিকে। তার সব আশা সব ভরসা যেন তলিয়ে গেছে ওই ছোট নৌকাটার সঙ্গে সঙ্গে।

## এগারো

পুরো ফীচারটা আরেকবার খুঁটিয়ে পড়ল কিশোর। এতই মগ্ন রইল পড়ায়, সময় কোন্‌দিক দিয়ে বেরিয়ে গেল টেরই পেল না।

দুপুরের খাবার দেবে কিনা জিজ্ঞেস করতে এল মিসেস ওয়েলটন। মুসা আর রবিনকে না দেখে ওরা কোথায় গেছে জানতে চাইল।

চোখ মিটমিট করে তাকাল কিশোর। তাই তো! লাঞ্চের সময় তো ওদের ফিরে আসার কথা! মোহরের খোঁজ করতে করতে খিদেই ভুলে গেল!

'বাইরে গেছে,' মিসেস ওয়েলটনকে বলল কিশোর। এসে যাবে যে-কোন

মুহূর্তে। আমার খাবার দিন। ডাক্তারের কাছে যাবার সময় হয়ে গেছে।'

নাক দিয়ে অনবরত পানি গড়াচ্ছে। রুচি নেই। এক গ্লাস দুধ দিয়ে কোনমতে একটা স্যাণ্ডউইচ গিলে নিল কিশোর। তারপর বেরিয়ে পড়ল।

বোর্ডিং হাউসের কয়েকটা বাড়ি পরেই ডাক্তার রোজারের চেম্বার, মিসেস ওয়েলটনকে জিজ্ঞেস করে জেনে নিয়েছে কিশোর।

রাস্তায় লোকজন কম। কলোনি টাইপের কয়েকটা বাড়ি পেরিয়ে এল কিশোর। রঙ চটে গেছে, প্লাস্টার উঠে গেছে জায়গায় জায়গায়। কয়েকটা খালি দোকান পেরোল। দরজায় ঝুলছে 'ভাড়া দেওয়া হইবে' নোটিশ। পরিষ্কার বোঝা যায়, ফিশিংপোর্টের সময় খুব খারাপ যাচ্ছে।

আশপাশের বাড়িগুলোর তুলনায় ডাক্তার রোজারের বাড়িটা নতুন। লাল ইটের তৈরি, ছোটখাট, ছিমছাম। ওয়েটিং রুমে ঢুকল কিশোর। দুটো বাচ্চা নিয়ে বসে আছে এক মহিলা। খানিক দূরে বসেছে দু'জন বৃদ্ধ, শূন্য দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে সামনের দেয়ালের দিকে।

কিশোরের দিকে তাকাল ডেস্কের ওপাশে বসা নার্স। ডাক্তারের চেম্বারের দরজা দেখিয়ে দিল। সোজা ঢুকে যেতে বলল।

মাঝারি আকারের একটা কামরা। এক পাশে একটা ছোট ডেস্ক। কাছেই একটা বিছানা, ওতে শুইয়ে পরীক্ষা করা হয় রোগীকে। দু'পাশের দেয়াল ঘেঁষে দাঁড়িয়ে আছে কয়েকটা আলমারি। সাদা রঙ করা। ওষুধের শিশি বোতলে ঠাসা।

ডেস্কের ওপাশে বসে আছেন ডাক্তার রোজার। ধূসর হয়ে এসেছে চুল। একটা স্যাণ্ডউইচ খাচ্ছেন।

'হ্যাল্লো, কিশোর পাশা,' হেসে বললেন ডাক্তার, 'তোমার জন্যেই অপেক্ষা করছি। এসো, বসো।'

স্যাণ্ডউইচটা খেয়ে নিলেন ডাক্তার। এক ঢোক কফি খেয়ে উঠে দাঁড়ালেন। বিছানায় গিয়ে শুতে ইঙ্গিত করলেন কিশোরকে।

দ্রুত অভ্যস্ত হাতে কিশোরের নাক গলা কান পরীক্ষা করলেন ডাক্তার। গলায় স্টেথো লাগিয়ে হার্টবিট শুনলেন। টোকা দিয়ে পরীক্ষা করলেন বুক। তারপর ব্লাডপ্রেশার দেখলেন।

'হুঁমম,' মাথা ঝোঁকালেন ডাক্তার। 'ঠাণ্ডা লাগিয়েছ ভাল মতই। এখানকার আবহাওয়া সহ্য হয়নি...'

আলমারি খুলে একটা শিশি বের করলেন ডাক্তার। একটা ছোট খামে কয়েকটা বড়ি ঢেলে নিলেন। খামটা কিশোরের দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বললেন, 'ভাবনা নেই। চার ঘন্টা পর পর দুটো করে বড়ি খেয়ো। দু'দিনেই সেরে যাবে। তবে হ্যাঁ, নড়াচড়া বেশি করবে না, বিশ্রাম নেবে। সাগরের ধারে কাছে যাবে না।'

'ঠিক আছে,' বলল কিশোর। এক মুহূর্ত দ্বিধা করল। 'আচ্ছা, স্যার, আমাকে

কয়েক মিনিট সময় দিতে পারবেন? কিছু কথা…'

'লাঞ্চ টাইম,' কিশোরের দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন ডাক্তার। 'খেতে খেতে কথা বলতে পারব। ওইটুকু সময় পাবে।' ঘুরে গিয়ে ডেস্কের ওপাশে চেয়ারে বসে পড়লেন আবার তিনি। 'হ্যাঁ, শুরু কর। কি জানতে চাও?'

'আমি মানে…কিছু তথ্য দরকার,' বলল কিশোর। 'শুনলাম আপনি স্কেলিটন আইল্যাণ্ডের মালিক…'

'স্কেলিটন আইল্যাণ্ড!' হাত তুললেন ডাক্তার। 'ওই হতচ্ছাড়া দ্বীপের কথা রাখ! শুনতে শুনতে কান ঝালাপালা হয়ে গেছে! মরার আর জায়গা পেল না হতভাগিটা! মরে নাকি ভূত হয়েছে!'

'তাহলে ভূত মানেন না আপনি? জেলেদের কথা বিশ্বাস করেন না?' জিজ্ঞেস করল কিশোর।

'আরে দুত্তোর! ভূত আছে নাকি! সব ব্যাটা জেলেদের কুসংস্কার। স্যালি মারা যাবার পর কোন পাজি লোক ভূত সেজে গিয়ে নাগরদোলায় চড়েছিল হয়ত। মেয়েটার একটা রুমাল জোগাড় করে নিয়ে ফেলে এসেছিল পার্কে। সব সাজানো ব্যাপার। জানি কার কাজ। কিন্তু প্রমাণ করতে পারব না। দ্বীপে যাতে লোকজন না যায়, সেজন্যেই এই শয়তানী।'

মাথা ঝোঁকাল কিশোর। ডাক্তারের কথায় যুক্তি আছে।

'দুর্ঘটনায় মারা গেল একটা মেয়ে,' আবার বললেন ডাক্তার। 'কয়েক রাত পরে দেখা গেল তার ভূত। ব্যস, আর কি যেতে চায় কেউ ওখানে। ধীরে ধীরে বন্ধ হয়ে গেল প্লেজার পার্ক। জাঁকিয়ে উঠল মেলভিলের আরেকটা পার্ক। প্লেজার পার্কের সব কাস্টোমার চলে গেল ওখানে। ব্যাটারা মনে করেছে, আমি কিছু বুঝি না।'

কাপে কফি ঢাললেন ডাক্তার। আরেকটা স্যাণ্ডউইচ তুলে নিলেন সামনের প্লেট থেকে। 'নাও, তুমি খাও।'

মাথা নাড়ল কিশোর। 'না, আপনি খান। আমি খেয়ে এসেছি।'

'পার্কটা চালাত আমার বাবা,' স্যাণ্ডউইচ চিবাতে চিবাতে বলল ডাক্তার। 'আমি তখন ছাত্র। বাবার মৃত্যুর পর দ্বীপের মালিক হলাম আমি। কিন্তু ওই পর্যন্তই। একটা কানাকড়িও এল না ওখান থেকে।…অনেক বছর পর সিনেমা কোম্পানি এসে ভাড়া নিল দ্বীপটা। কিছু পয়সা পাব এবার।' হঠাৎ সামনে ঝুঁকে এলেন তিনি। 'আচ্ছা, সত্যি শূটিঙের জন্যেই এসেছে তো দলটা? গুজব শুনছি, ওয়ান-ইয়ারের ম্যাপ নিয়ে নাকি…'

'ভুল শুনেছেন,' বাধা দিয়ে বলল কিশোর। 'ছবির শূটিং করতেই এসেছে দলটা।'

'হুমম! সত্যি হলেই ভাল। দ্বীপটা আমার। ওতে গুপ্তধন থাকলে ওগুলো

আমারই হওয়া উচিত, তাই জিজ্ঞেস করলাম।'

'আমার মনে হয়, নেই। কোন জায়গা তো আর খোঁজা বাদ রাখেনি লোকে। থাকলে, পেয়ে যেতই।'

'তা-ও ঠিক,' আবার স্যাণ্ডউইচে কামড় দিলেন ডাক্তার।

'আচ্ছা, ডক্টর,' বলল কিশোর। 'সিনেমা কোম্পানির জিনিসপত্র চুরি যাচ্ছে, নিশ্চয় শুনেছেন। কারা, কেন চুরি করছে, কিছু অনুমান করতে পারেন?'

অবশিষ্ট স্যাণ্ডউইচটুকু মুখে পুরলেন ডাক্তার। চিবিয়ে গিলে ফেললেন। কফির কাপ টেনে নিতে নিতে বললেন, 'অনুমান তো কত কিছুই করা যায়। এই যেমন, কেউ একজন চায় না, দ্বীপে শূটিং করুক সিনেমা কোম্পানি। মেলভিলের সেই পার্কের মালিকও হতে পারে। দ্বীপটাতে লোক যাতায়াত শুরু করলে হয়ত আবার চালু হতে পারে প্লেজার পার্ক। সেজন্যেই তাড়াতে চাইছে সিনেমা কোম্পানিকে। অন্য কারণেও হতে পারে চুরি। এখানকার লোক বড় গরীব। ঝিনুকে রোগ দেখা দেবার পর থেকে অনেকেরই রুটি জোটে না। ওদের কেউ পেটের দায়ে চুরি করছে হয়ত জিনিসপত্র।'

'কিন্তু ঠিক যেন মিলছে না!' চিন্তিত ভঙ্গিতে বলল কিশোর।

'রহস্যের সমাধান করতে চাইছ, না?' হাসলেন ডাক্তার। 'গোয়েন্দাগিরি?'

পকেট থেকে একটা কার্ড বের করল কিশোর। ডাক্তারের দিকে বাড়িয়ে ধরল।

কার্ডটা নিয়ে পড়লেন ডাক্তার। হাসলেন আবার। ফিরিয়ে দিতে দিতে বললেন, 'তাহলে সত্যিই তোমরা গোয়েন্দা? বেশ বেশ। আত্মবিশ্বাস থাকা ভাল। তোমাদেরকেই তাহলে দ্য হ্যাণ্ডে ফেলে রেখে এসেছিল হান্ট গিল্ডার। কেন, বল তো?'

'হয়ত ভয় দেখাতে,' বলল কিশোর। 'কেউ একজন হয়ত চায়, আমরা আবার হলিউডে ফিরে যাই। এখানে থাকলে, খোঁজখবর করলে, তার অসুবিধে হবে।'

'হুঁমম!' ভুরু কুঁচকে কিশোরের দিকে চেয়ে আছেন ডাক্তার। 'তোমার কথায় যুক্তি আছে। ফেলে দেয়া যায় না।'

'আচ্ছা, স্যার, আরেকটা কথা,' ডাক্তারের দিকে তাকাল কিশোর। 'ঠিক কবে থেকে আবার দেখা দিতে শুরু করেছে নাগরদোলার ভূত? বলতে পারবেন?'

'কবে থেকে?' নিজের চিবুকে আলতো টোকা দিলেন ডাক্তার। 'দুই···হ্যাঁ, দু'বছরই হবে। হঠাৎ দেখা দিতে শুরু করল ভূতটা। বেশ ঘন ঘন। কেন, একথা জানতে চাইছ কেন?'

'শিওর না হয়ে বলা উচিত না, স্যার। আচ্ছা, উঠি। আপনার অনেক সময় নষ্ট করে দিলাম।'

'না না, ও কিছু না,' উঠে দাঁড়ালেন ডাক্তার। 'ভূত রহস্যের সমাধান করতে

পারলে জানিও আমাকে। আর হ্যাঁ, আবার মনে করিয়ে দিচ্ছি, দ্বীপে গুপ্তধন থাকলে, তার মালিক কিন্তু আমি।'

ডাক্তারকে ধন্যবাদ জানিয়ে বেরিয়ে এল কিশোর। চিন্তিত। বেশ কয়েকটা রহস্য একসঙ্গে এসে জড় হয়েছে। কিছুতেই জট ছাড়ানো যাচ্ছে না। এ-নিয়ে আরও অনেক বেশি ভাবতে হবে।

পথে এসে নামল কিশোর। পাশ কাটিয়ে চলে গেল একটা গাড়ি। ঘ্যাচ করে ব্রেক কষার আওয়াজ হল। পিছিয়ে এল গাড়িটা। কিশোরের পাশে এসে দাঁড়িয়ে পড়ল।

'এই যে, খোকা,' জানালা দিয়ে মুখ বের করে ডাকলেন পুলিশ চীফ হোভারসন, 'কোথায় গিয়েছিলে?'

'ডাক্তারের কাছে,' বলল কিশোর।

'কেন?'

'সর্দি।'

'ও। হ্যাঁ, শুনেছ, হান্টকে ধরতে পারিনি। ব্যাটা পালিয়েছে।'

'পালিয়েছে?'

'একটা মালবাহী জাহাজে কাজ নিয়েছে। আজ সকালে ছেড়ে গেছে জাহাজটা। কয়েক মাসের মধ্যে ফিরবে না। ওর এক বন্ধুকে ধরেছিলাম। ওই ব্যাটা বলল, গোয়েন্দা জেনে তোমাদেরকে নিয়ে একটু মজা করছে হান্ট। আমার কিন্তু বিশ্বাস হচ্ছে না।'

'আমারও না,' বলল কিশোর।

'কিন্তু কি আর করা? ব্যাটাকে তো ধরতে পারলাম না,' বললেন হোভারসন। 'ঠিক আছে, চলি। তোমাদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখব। নতুন কিছু জানতে পারলে জানাব।'

গাড়ি চালিয়ে চলে গেলেন হোভারসন। আবার বোর্ডিং হাউসের দিকে হাঁটতে লাগল কিশোর। চিমটি কাটছে নিচের ঠোঁটে।

লোকটার ওপর প্রায় হুমড়ি খেয়ে পড়ল কিশোর। পাশের এক গলি থেকে আচমকা বেরিয়ে এসে পথ রোধ করেছে তার। হালকা-পাতলা। কুৎসিত হাসিতে বিকৃত হয়ে আছে মুখ।

'এই ছেলে, দাঁড়াও,' আঙুল তুলল লোকটা। 'তোমাকে কিছু উপদেশ দেব।'

'নিশ্চয় নিশ্চয়, বলুন কি বলবেন?' চেহারা বোকা বোকা করে রেখেছে কিশোর। ইচ্ছে করলেই চেহারাটাকে এমন হাবাগোবা করে তুলতে পারে সে। এতে কাজ দেয় অনেক সময়, দেখেছে।

'আমার উপদেশ, হাড়গোড় আস্ত রাখতে চাইলে হলিউডে ফিরে যাও। সঙ্গে নিয়ে যাও সিনেমা কোম্পানিকে। ফিশিংপোর্টে তোমাদেরকে কেউ চায় না।'

দু'দিকের কান পর্যন্ত বিস্তৃত হল লোকটার কুৎসিত হাসি। তার হাতের দিকে চোখ পড়ল কিশোরের। বাঁ হাতের উল্টো পিঠে উল্কিতে আঁকা ছবি। স্পষ্ট নয়। তবে বুঝতে অসুবিধে হয় না, ছবিটা জলকুমারীর। ভয়ের ঠাণ্ডা একটা শিহরণ উঠে গেল কিশোরের মেরুদণ্ড বেয়ে।

'ঠিক আছে, স্যার,' ভোঁতা গলায় বলল কিশোর। বলব ওদেরকে। কিন্তু কে যেতে বলছে, কার নাম বলব?'

'বেশি চালাকির চেষ্টা কোরো না, ছেলে,' কর্কশ গলায় বলল লোকটা। 'ভাল চাইলে আজই ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে যাও।'

হঠাৎ ঘুরে দাঁড়াল লোকটা। গট গট করে হেঁটে আবার ঢুকে পড়ল গলিতে।

লোকটা চলে যাবার পরও কয়েক মুহূর্ত তার গমন পথের দিকে চেয়ে রইল কিশোর। চেপে রাখা শ্বাসটা ফেলল শব্দ করে। তারপর আবার হাঁটতে শুরু করল বোর্ডিং হাউসের দিকে।

একটা ব্যাপারে এখন নিশ্চিত কিশোর। দ্বীপে সিনেমা কোম্পানির থাকাটা বরদাস্ত করতে পারছে না কেউ একজন।

## বারো

'আমার নৌকা!' বিড়বিড় করে বলল পাপালো। জোর করে ঠেকিয়ে রেখেছে চোখের পানি। 'নৌকা নেই। গুপ্তধন খোঁজার আশা শেষ!'

'তাই তো!' পাপালোর কত বড় ক্ষতি হয়ে গেছে, এতক্ষণে বুঝতে পারল যেন রবিন। 'কিন্তু একাজ করল কেন লোকটা? দুর্ঘটনা, নাকি ইচ্ছে করেই?'

'ইচ্ছে করে!' রাগ প্রকাশ পেল পাপালোর গলায়। 'নইলে থামত ও। এসে জিজ্ঞেস করত, বোটটা কার। দুঃখ প্রকাশ করত।'

'ঠিকই বলেছ,' বলল রবিন। 'কিন্তু কেন? তোমার নৌকা ভেঙে দিল কেন? কার কি লাভ?'

'আমি মোহর খুঁজে বেড়াই, এটা লোকের পছন্দ না,' কাঁদো কাঁদো গলায় বলল পাপালো। 'জেলেরা দেখতে পারে না আমাকে। এই উপসাগর ওদের। এতে বাইরের কারও ভাগ বসানো সইতে পারে না।'

দীর্ঘ এক মুহূর্ত নীরবতা। যতদূর চোখ যায়, কোন নৌকা বা জাহাজের চিহ্নও নেই। আর কতক্ষণ থাকতে হবে এ-দ্বীপে?

'তোমার নৌকা গেল,' অবশেষে বলল রবিন। 'দামি অনেক জিনিসপত্র গেল আমাদেরও।'

'হ্যাঁ,' গম্ভীর হয়ে আছে মুসা। 'অনেক দামি।'

একে অন্যের দিকে চেয়ে আছে দুই গোয়েন্দা। দু'জনের মনে একই ভাবনা। এক সঙ্গে চেঁচিয়ে উঠল দু'জনে, 'ওগুলো তো তুলে আনতে পারি আমরা!'

বিষণ্নতা ঝেড়ে ফেলল পাপালো। হাসল। 'নিশ্চয় পারি। চল। আমি সাহায্য

করব তোমাদেরকে।'

তাড়াহুড়ো করে ডুবুরির পোশাক পরে নিল আবার রবিন আর মুসা। পানিতে নামল। হেঁটে চলল। ডুব দিল গভীর পানিতে এসে।

পানির ওপরে রোদ। ছোট ছোট ঢেউ। তলার বালিতে শুয়ে থাকা নৌকার গায়ে বিচিত্র ভঙ্গিতে নাচছে সূর্যের আলো। ফ্লিপার নাচিয়ে দ্রুত নেমে চলেছে রবিন আর মুসা। পাপালোর ওসব দরকার নেই। ভারি একটা পাথর ধরে রেখেছে দু'হাতে। দুই সঙ্গীর চেয়ে অনেক দ্রুত নামছে পাথরের ভারে।

নৌকার কাছে পৌঁছে গেল পাপালো। অর্ধেক পথও নামতে পারেনি এখনও অন্য দু'জন। এক পাশে কাত হয়ে আছে নৌকাটা। জিনিসপত্র ভেতরে কিছু কিছু ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে আশপাশে। দু'হাতে যা পারল, নিয়ে রওনা হয়ে গেল আবার ওপরে।

পাশ দিয়ে নামার সময় পাপালোকে হাসতে দেখল দুই গোয়েন্দা। সাগরের শান্ত তলদেশে এসে কেমন এক ধরনের অনুভূতি জাগল। বিপদে পড়েছে, ভুলেই গেল। পাশাপাশি নেমে এল নৌকাটার ধারে। সাপের মত নাচছে পালের দড়ি। দড়ির কাছ থেকে দূরে থাকল রবিন। কি জানি, আবার যদি পায়ে পেঁচিয়ে যায়! নিজের একটা প্যান্ট পড়ে থাকতে দেখে তুলে নিল। পাপালোর জুতোজোড়া তুলে নিল মুসা। আরও জিনিসের জন্যে চাইল এদিক ওদিক।

খুব ধীরে ধীরে এপাশ ওপাশ দোল খাচ্ছে নৌকাটা, ছেঁড়া পালটাও দুলছে তালে তালে। বেশ জোরালো স্রোত বইছে পানির তলায়।

মিনিট পাঁচেকের মধ্যেই যা তোলার, তুলে ফেলল ওরা। অগভীর পানিতে এসে দাঁড়াল। তিনজনেরই দু'হাত বোঝাই জিনিসপত্রে।

'মনে হয় আর কিছু নেই,' হেসে বলল পাপালো। 'সবই তুলে এনেছি।'

'তাই তো মনে হচ্ছে,' বলল মুসা।

ছপাৎ ছপাৎ আওয়াজ তুলে হেঁটে চলল ওরা তীরের দিকে।

তীরে পৌঁছে ভেজা জিনিসপত্র নামিয়ে রাখল। বসে পড়ল ওগুলোর পাশে।

হঠাৎ কি মনে পড়তেই কাপড়ের স্তূপে খুঁজতে শুরু করল পাপালো। পেল না। 'আরে! আমার কম্পাস কই! তোমরা তোলনি?'

এদিক ওদিক মাথা নাড়ল দুই গোয়েন্দা।

'তোমরা বস। আমি নিয়ে আসছি।' আবার পানিতে নামল গিয়ে পাপালো।

'কাপড়গুলো চিপে ছড়িয়ে দেয়া দরকার। শুকাক।' বলল মুসা।

মাথা ঝুঁকিয়ে সায় দিল রবিন।

কাপড় শুকাতে দিয়ে এসে আবার আগের জায়গায় বসল ওরা।

'খবর পাঠানর কোন উপায় নেই!' সাগরের দিকে চেয়ে বলল রবিন। 'রাফাত চাচা গাধা ভাববেন আমাদেরকে। বোকার মত আবার আটকা পড়েছি এসে এই দ্বীপে।'

'এটা আমাদের দোষ নয়, পাপালোরও না,' ভারি একটা টর্চের পানি ঝাড়তে ঝাড়তে বলল মুসা। 'এখন না পারলেও অন্ধকার হলে পারব। টর্চের সাহায্যে।'

'কিন্তু অন্ধকার হতে এখনও অনেক দেরি,' আকাশের দিকে তাকাল একবার রবিন। 'খিদেয় পেট জ্বলছে। এতক্ষণ সইব কি করে!'

'কাপড়গুলো শুকাক আগে। খিদের ব্যাপারটা নিয়ে পরে ভাবা যাবে, পাপালো আসুক।'

এই সময় মনে হল ওদের, পাপালো গেছে অনেকক্ষণ। এতক্ষণ ফিরে আসার কথা তার। ফিরে তো এলই না, একবার ভাসেওনি এ-পর্যন্ত। সঙ্গে গ্যাস ট্যাংক নেই। একটানা পনেরো মিনিট দম আটকে রাখতে পারে না কোন মানুষ! সতর্ক হয়ে উঠল ওরা। বিপদের গন্ধ পেল। 'নিশ্চয়,' বিড়বিড় করে বলল রবিন। 'নিশ্চয় কোন বিপদে পড়েছে!'

'কোন কিছুতে আটকে যায়নি তো!' ফ্যাকাসে হয়ে গেছে মুসার মুখ। 'জলদি চল, দেখি কি ঘটেছে!'

দ্রুত আবার ডুবুরির সরঞ্জাম পরে নিল দু'জনে। পানিতে এসে নামল। হেঁটে চলে এল গভীর পানির ধারে। সবুজ পানিতে উজ্জ্বল রোদ। নিচের দিকে তাকাল ওরা একবার। পেছন ফিরে চিত হয়ে পড়ল পানিতে। ডুব দিল।

আগের মতই পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে তলার বালি। কিন্তু পাপালো কোথায়? নৌকাটাও নেই! দ্রুত নেমে চলল দু'জনে। ধড়াস ধড়াস করছে বুকের ভেতর।

ওপরের দিকে কয়েক ফুট ঢালু হয়ে নেমেছে পাথরের দেয়াল, তারপর একবারে খাড়া। ছোটবড় অনেক গর্ত দেয়ালে। ওগুলোর কোনটা হয়ত সুড়ঙ্গমুখ, ভেতর দিয়ে বয়ে যাচ্ছে তীব্র স্রোত, নৌকাসহ পাপালোকে টেনে নিয়েছে, ভাবল রবিন।

না, নৌকাটা আছে। আগের জায়গায় নয়। ওখান থেকে বিশ ফুট দূরে। দেয়ালের গা ঘেঁষে পড়ে আছে। দুলছে ধীরে ধীরে। বাড়ি খাচ্ছে পাথুরে দেয়ালে।

তাড়াতাড়ি নৌকার দিকে সাঁতরে চলল দুই গোয়েন্দা। কাছে চলে এল। কিন্তু কোথায় পাপালো? নৌকার তলায় মরে পড়ে নেই তো?

বালিতে এসে ঠেকল রবিন। ভয়ে ভয়ে উঁকি দিল নৌকার তলায়। না, নেই ওখানে পাপালো। গেল কোথায়! এখানকার পানিতে হাঙর নেই, জানা আছে রবিনের। অক্টোপাস বা ওই ধরনের কোন ভয়াবহ সামুদ্রিক জীবও নেই। তাহলে?

বাহুতে ছোঁয়া লাগতেই প্রায় চমকে উঠল রবিন। ফিরে চাইল। মুসা। দুটো আঙুল জড়ো করে দেখাল গোয়েন্দা সহকারী। ইঙ্গিতটা বুঝল রবিন। পাশাপাশি থাকতে বলছে। আঙুল তুলে একটা গর্ত দেখাল মুসা। তারপর সাঁতরাতে শুরু করল ওদিকে।

পাশাপাশি কয়েকটা গর্ত। উঁকি দিয়ে দেখল দু'জনে। ভেতরটা অন্ধকার। টর্চ আনা উচিত ছিল। গর্তের মুখে পানিতে হাত দিয়ে নাড়া দিয়ে দেখল। কোন

জবাব এল না। বেরিয়ে এল শুধু ছোট মাছের দল।

বড় বড় কিছু গর্তের মুখে ঘন হয়ে জন্মেছে শেওলা। ওপরের দিকে মাথা তুলে দুলছে তালে তালে। দু'হাতে ওগুলো সরিয়ে উঁকি দিতে হচ্ছে ওসব গর্তের ভেতরে। কিন্তু অন্ধকার ছাড়া আর কিছুই চোখে পড়ছে না।

পাঁচ মিনিট পেরিয়ে গেল। দেয়ালের ধার ধরে ধরে প্রায় শ'খানেক ফুট চলে এসেছে ওরা নৌকার কাছ থেকে। কিন্তু পাপালোর কোন চিহ্নই নেই।

থেমে গেল ওরা। মুখ কাছাকাছি নিয়ে এল। মাস্কের ভেতরে দু'জনের চোখ দেখতে পাচ্ছে দু'জনে। মুসার চোখ বড় বড় হয়ে গেল, দেখল রবিন। উদ্বেগ প্রকাশ পাচ্ছে। বুড়ো আঙুল তুলে উল্টো দিক দেখাল সে। মাথা ঝোঁকাল মুসা। দু'জনে আবার এগিয়ে চলল নৌকাটার দিকে।

নৌকার কাছাকাছি পৌঁছে গেছে ওরা। এই সময় দেখতে পেল ওকে। দ্রুত উঠে যাচ্ছে ওপরে। পাপালো। আশ্চর্য! বিশ মিনিট পানির তলায় দম আটকে রাখতে পারল! অবাক হল দুই গোয়েন্দা। ওরাও উঠতে শুরু করল ওপরের দিকে।

ভুসস করে মাথা তুলল দুই গোয়েন্দা। কোমর পানিতে দাঁড়িয়ে আছে পাপালো। হাঁ করে শ্বাস নিচ্ছে জোরে জোরে। অক্ষতই মনে হচ্ছে। ওদেরকে দেখে হাসল।

পাপালোর পাশে চলে এল দুই গোয়েন্দা। ঠেলে মুখের একপাশে সরিয়ে দিল মাস্ক।

'পাপু!' হাঁপাতে হাঁপাতে বলল মুসা। 'ভয় পাইয়ে দিয়েছিলে আমাদেরকে!'

'কোথায় ছিলে তুমি?' বন্ধুকে সুস্থ দেখে হাসি ফুটেছে রবিনের মুখে। 'কি হয়েছিল?'

হাসল আবার পাপালো। 'একটা জিনিস পেয়েছি। বলত কি?'

'তোমার কম্পাস।'

এদিক ওদিক মাথা নাড়ল গ্রীক কিশোর। জ্বলজ্বল করছে কালো চোখের তারা। 'হয়নি। আবার বল।'

'বুঝেছি! মোহর!' চেঁচিয়ে উঠল মুসা।

হাসছে পাপালো। ডান হাত বাড়াল। মুঠো খুলল। এক টুকরো সোনা। মুদ্রা ছিল এককালে। বেঁকেচুরে গেছে ধারগুলো।

'মোহরের সিন্দুকটা পেয়েছ নাকি?' জানতে চাইল রবিন।

'না। দেয়ালের একটা গর্ত দিয়ে মাছ ঢুকতে বেরোতে দেখলাম। ভাবলাম, মাছেরা যদি পারে, পাপুও পারবে। ঢুকে পড়লাম ভেতরে।' চুপ করল পাপালো। নাটকীয় ভঙ্গিতে বলল, 'দ্বীপের তলায় এক গুহা আবিষ্কার করেছি। ওখানেই পেয়েছি এই সোনার টুকরো। বাজি ধরে বলতে পারি, আরও অনেক মোহর আছে ওখানে।'

# তেরো

পাশাপাশি ভেসে আছে মুসা আর রবিন। তল থেকে পাঁচ ফুট ওপরে। বিচিত্র শব্দ তুলে ব্রীদিং টিউব থেকে বেরিয়ে ওপরে উঠে যাচ্ছে বুদবুদ। পাশ দিয়ে অলস ভঙ্গিতে ভেসে চলে গেল এক ঝাঁক সাগর-কই, ঢুকে পড়ল সামনের দেয়ালের গর্তে, হারিয়ে গেল অন্ধকারে।

মণি ছাড়া বিশাল এক চোখের মত দেখতে লাগছে সুড়ঙ্গমুখটাকে। এক কোণ থেকে আরেক কোণের দৈর্ঘ্য বারো ফুট। চোখের মাঝামাঝি জায়গায় উচ্চতা ফুট পাঁচেক। ধারগুলো মসৃণ, শেওলা জন্মাতে পারে না স্রোতের জন্যে।

সুড়ঙ্গমুখের বিশ ফুট দূরে পড়ে আছে পাপালোর নৌকাটা। দুলছে। জায়গা বদল করেছে ধীরে ধীরে। এগিয়ে আসছে এদিকেই। সেদিকে একবার চেয়েই চোখ ফিরিয়ে নিল রবিন। নৌকার প্রতি খেয়াল দেবার সময় নেই এখন।

দুই গোয়েন্দার হাতে টর্চ। সুড়ঙ্গে ঢুকতে ইতস্তত করছে।

পাপালোর কথামত, কোন বিপদ নেই গুহায়। কম্পাস খুঁজতে এসেছিল সে। পায়নি। উঠে যাবার সময়ই নজরে পড়েছে সুড়ঙ্গমুখটা। কৌতূহলী হয়ে এগিয়ে এসেছে ওটার কাছে। ঢুকে পড়েছে।

ভেতরের দিকে প্রথমে সরু হয়ে, তারপর ধীরে ধীরে প্রশস্ত হয়ে গেছে সুড়ঙ্গ। খানিকটা এগিয়ে পেছনে ফিরে চেয়েছে পাপালো। সুড়ঙ্গমুখ দেখা যাচ্ছে, ইচ্ছে করলে ফিরে যাওয়া যায়। কিন্তু ফেরেনি সে। সামনে কি আছে, দেখার ইচ্ছে।

দম ফুরিয়ে আসতেই টনক নড়েছে পাপালোর। সামনে অন্ধকার, কি আছে কে জানে! পেছনে তাকিয়ে দেখেছে, অনেক দূরে আলো। এতদূর যেতে পারবে না, তার আগেই দম ফুরিয়ে যাবে।

'আতঙ্কে ঠাণ্ডা হয়ে আসছিল হাত-পা,' দুই গোয়েন্দাকে বলছে পাপালো। 'কিন্তু মাথা গরম করলাম না। ফিরে-যাবার চেষ্টা করলে মরব। সামনে এগোলে হয়ত বেঁচে যাব। সুড়ঙ্গটা কোন গুহায় গিয়ে শেষ হলে বাতাস পেয়ে যেতে পারি। প্রাণপণে সাঁতরে চললাম। খানিকটা এগোতেই আলো চোখে পড়ল। ভরসা পেলাম। আলোর দিকে উঠতে লাগলাম। ভুসস করে মাথা ভেসে উঠল পানির ওপরে। দম নিয়ে তাকালাম চারদিকে। আবছা অন্ধকার। একটা গুহায় ঢুকেছি আমি। দ্বীপের তলায়। শেওলায় ঢাকা একটা পাথুরে তাকে উঠে বসলাম। জিরিয়ে নিয়ে নামব ভাবছি, এই সময়ই হাতে লাগল শক্ত জিনিসটা। শেওলার ভেতরে আটকে আছে। কৌতূহল হল। তুলে নিলাম। ও মা! সোনা! তালগোল পাকানো মোহর! গুহার তলায় অন্ধকার। দেখা যায় না কিছু। আমার বিশ্বাস, আরও গুপ্তধন আছে ওখানে।'

পানির তলায় গুহা, জলদস্যুর গুপ্তধন, আর কি চাই! সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলল দুই গোয়েন্দা, ঢুকবে ওখানে। কোনরকম সরঞ্জাম ছাড়া পাপালো যদি পারে, আধুনিক

ডুবুরির সরঞ্জাম নিয়ে ওরা ঢুকতে পারবে না কেন? তাড়াতাড়ি চলে এসেছে এখানে। কিন্তু সুড়ঙ্গমুখের চেহারা দেখেই ভয় ঢুকে গেছে মনে। ইতস্তত করছে ভেতরে ঢুকতে।

এই সময় ওপর থেকে নেমে এল পাপালো। দুই গোয়েন্দার পাশ কাটিয়ে সুড়ুৎ করে ঢুকে পড়ল সুড়ঙ্গে। আর দ্বিধা করার কোন মানে হয় না। যা থাকে কপালে, ভেবে, ঢুকে পড়ল দু'জনে।

দুটো টর্চের জোরালো আলোয় অন্ধকার কেটে গেল। পরিষ্কার পানি, স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে সামনের অনেক দূর পর্যন্ত। ধীরে ধীরে প্রশস্ত হচ্ছে সুড়ঙ্গ। পাথুরে দেয়ালের খাঁজে খাঁজে ভারি হয়ে জন্মেছে শেওলা। উজ্জ্বল আলোয় চমকে গেল মাছের দল। এদিক ওদিক ছুটে পালাল। অন্ধকার ছোট একটা গুহার ভেতর থেকে বেরিয়ে এল একটা সবুজ মাথা। হাঁ করা কুৎসিত মুখে খুরের মত ধারালো দাঁতের সারি। কুতকুতে চোখ। বান পরিবারের এক ভয়ানক সদস্য, মোরে ঈল। মাছটার ওপর চোখ রেখে অনেক দূর দিয়ে সরে এল দুই গোয়েন্দা।

পাপালোকে দেখা যাচ্ছে। অনেক সামনে রয়েছে সে। ওর মত তাড়াতাড়ি সাঁতার কাটতে পারছে না দুই গোয়েন্দা। পাথুরে দেয়ালে ঘষা লাগলে ছাল চামড়া উঠে যাবে। টিউব কিংবা পিঠের ট্যাংকের ক্ষতি হতে পারে। তাই সতর্ক থাকতে হচ্ছে ওদের।

মাঝে মধ্যে ওপরের দিকে টর্চের আলো ফেলছে ওরা। হঠাৎ অদৃশ্য হয়ে গেল পাথরের দেয়াল। উঠতে শুরু করল দুই গোয়েন্দা। বিশ ফুট…তিরিশ ফুট… আচমকা মাস্ক বেরিয়ে এল পানির ওপরে।

টর্চের আলো ফেলল দু'জনে। একটা পাথুরে তাকে উঠে বসে আছে পাপালো। পা দুটো ঝুলছে পানিতে। মাথার চার পাঁচ ফুট গুহার ওপরে ছাত এবড়োখেবড়ো, রুক্ষ। পিচ্ছিল শেওলায় ঢাকা তাকে পাপালোর পাশে সাবধানে উঠে বসল দুই গোয়েন্দা।

'দ্য হ্যাণ্ডের পেটে এসে ঢুকেছি আমরা,' বলল পাপালো। 'কেমন লাগছে গুহায় ঢুকে?'

'বেশ ভালই তো!' জবাব দিল রবিন। 'আমাদের আগে নিশ্চয় এখানে কেউ ঢোকেনি!'

চারদিকে টর্চের আলো ঘুরিয়ে আনল একবার রবিন। নির্দিষ্ট কোন আকার নেই গুহাটার। পানির সমতল থেকে ছাতের উচ্চতা একেক জায়গায় একেক রকম, চার থেকে ছয় ফুটের মধ্যে। গুহার এক প্রান্তে দু'দিকের দেয়াল অনেক কাছাকাছি, মাঝে পরিসর কম। আলো আসছে ওদিক থেকেই।

টর্চ নিভিয়ে নিল ওরা। আবছা আলো গুহার ভেতরে। পাথরে পাথরে ধাক্কা খেয়ে কুলকুল শব্দ তুলছে পানি। দেয়ালের গা আঁকড়ে ধরে আছে সরু শেওলা জাতীয় উদ্ভিদ। ঢেউয়ের তালে তালে দুলছে, ওঠানামা করছে ভয়াবহ কোন অজানা

দানবের রোম যেন। শিউড়ে উঠল রবিন। 'নিশ্চয় কোন ফাটল আছে গুহার ছাতে। আলো আসছে ওপথেই।' গুহার দূরতম প্রান্তের দিকে চেয়ে বলল সে।

'ফোয়ারা!' প্রায় চেঁচিয়ে উঠল পাপালো। 'এবার বুঝেছি। ওই ফাটল দিয়েই পানি ছিটকে বেরোয় ঝড়ের সময়। কেউ জানে না, তলায় একটা গুহা আছে। লোকের ধারণা, ফাটলটা সাগরের অতলে কোথাও নেমে গেছে।'

'ঠিক ঠিক!' বলে উঠল রবিন। মনে পড়ল, দু'রাত আগে ঝড়ের সময় কি করে পানি ছিটকে উঠেছিল টিলার চূড়ার ছিদ্র দিয়ে। অনেক আগেই ওই ফোয়ারা আবিষ্কার করেছে লোকে। জানত না, কেন শুধু ঝড়ের রাতেই পানি ছিটায় ওটা।

'একটা কথা!' হতাশ কণ্ঠে বলল রবিন। 'আমরাই যদি গুহাটা প্রথম আবিষ্কার করে থাকি, গুপ্তধন আসবে কোথা থেকে এখানে?'

'তাই তো!' গুঙিয়ে উঠল মুসা। 'এটা তো ভাবিনি!'

'আমরাই প্রথম নই, তাই বা জানছি কি করে?' প্রশ্ন রাখল পাপালো। 'এত হতাশ হবার কিছু নেই। একটা মোহর যখন পেয়েছি, আরও পাবার আশা আছে। রবিন, টর্চটা দাও তো, দেখে আসি।'

ওপরে বসে ধীরে ধীরে পানির তলায় আলো নেমে যেতে দেখল দুই গোয়েন্দা।

'মোহর লুকানর জন্যে এরচে ভাল জায়গা আর হয় না,' বলল মুসা। 'কিন্তু রবিন, মনে হয় তোমার কথাই ঠিক। আমাদের আগেও কেউ এসেছিল এখানে।'

তলায় নেমে গেছে পাপালো। এদিক ওদিক আলো নড়তে দেখল মুসা আর রবিন।

সময় কেটে যাচ্ছে। পাপালো আর ওঠে না। নিচে আলো নড়াচড়া করছে। নাহ্, দম রাখতে পারে বটে গ্রীক ডুবুরির ছেলে! ঝাড়া আড়াই মিনিট পরে উঠে এল পাপালো। উঠে বসল দুই গোয়েন্দার পাশে।

'ঠিকই বলেছ, রবিন,' বলল পাপালো। 'গুপ্তধন নেই এখানে। শামুক-গুগলির সঙ্গে কিছু কিছু এ-জিনিস আছে।' মুঠো খুলে দেখাল সে।

অবাক হয়ে দেখল দুই গোয়েন্দা, পাপালোর হাতে দুটো মোহর।

'ইয়াল্লা!' চেঁচিয়ে উঠল মুসা। 'গুপ্তধন নেই, তাহলে এগুলো কি!'

'আমি বলতে চাইছি, হাজার হাজার মোহর এক জায়গায় স্তূপ করে রাখা নেই। একটা দুটো ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে বালিতে।'

হাত থেকে হাতে ঘুরতে লাগল মোহর দুটো। ভারি। ধারগুলো বেশি ক্ষয়ে যায়নি এ-দুটোর।

'মোট তিনটে পেলাম!' বলল পাপালো। 'একেকজনের ভাগে একটা করে।'

'না, তুমি পেয়েছ ওগুলো,' প্রতিবাদ করল রবিন। 'তিনটেই তোমার।'

'এক সঙ্গে এসেছি। যে-ই পাই, সমান ভাগে ভাগ করে নেব,' দৃঢ় গলায় বলল পাপালো। 'চল, তিনজনে যাই এবার। আরও পাওয়া যাবে। হয়ত নতুন আরেকটা নৌকা কিনতে পারব। বাবার চিকিৎসা করাতে পারব। চল চল!'

দ্রুত হাতে ফেস মাস্ক পরে নিল মুসা আর রবিন। পাপালোর সঙ্গে সঙ্গে নেমে পড়ল পানিতে।

তলার বালিতে ছড়িয়ে আছে অসংখ্য শামুক-গুগলি, ঝিনুক। নামার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই পাথুরে দেয়ালের কাছে চকচকে বস্তুটা দেখতে পেল মুসা। কাত হয়ে আছে একটা ডাবলুন, অর্ধেকটা ডুবে আছে বালিতে।

আলতো করে ফ্লিপার নেড়ে এদিক ওদিক ঘুরে বেড়াতে লাগল রবিন। শিগগিরই একটা ঝিনুকের তলা থেকে বেরিয়ে থাকা মোহরের অর্ধেকটা চোখে পড়ল। তুলে নিল ওটা।

উত্তেজিত হয়ে পড়ল তিন কিশোর। আরও মোহর আছে এই গুহায়, বুঝতে পারল। সেগুলো খুঁজে বের করতেই হবে।

মোহর খুঁজতে খুঁজতে খিদে ভুলে গেল ওরা। সময়ের হিসেব রাখল না। এক ধার থেকে প্রতিটি ঝিনুক-শামুক উল্টে দেখতে লাগল। ফ্লিপার কিংবা হাতের নাড়া লেগে বালির মেঘ উঠছে মাঝে মাঝে, আচ্ছন্ন করে দিচ্ছে দৃষ্টি। থেমে, বালি নেমে যাবার অপেক্ষা করতে হচ্ছে তখন। তারপরই আবার শুরু হচ্ছে খোঁজা।

দেখতে দেখতে প্রায় দেড় ডজন মোহর বের করে ফেলল মুসা আর রবিন। একেকজনের ভাগে ছয়টা করে। হাতে আর জায়গা নেই। মুসার গায়ে টোকা দিল রবিন। ওঠার ইঙ্গিত করল। দম ফুরিয়ে যাওয়ায় ওদের আগেই উঠে গেছে পাপালো।

তাকে উঠে এল তিন কিশোর। পানি থেকে দূরে তাকের এক জায়গায় রাখল মোহরগুলো।

'ঠিকই বলেছ, পাপু,' মাস্ক সরিয়ে বলল রবিন। 'মোহর আছে এখানে! আরও আছে!'

'হ্যাঁ, আছে। আরও আছে,' বলল পাপালো। হাসল। হাতের মুঠো খুলে দেখাল। 'শেওলার তলায় এই তিনটে পেয়েছি আমি।'

'মোট হল চব্বিশটা!' বলল রবিন। কিন্তু মোহরগুলো এই গুহায় এল কি করে!'

'সেটা পরে ভাবলেও চলবে,' বলল মুসা। 'চল, আরও কিছু তুলে আনি।'

নেশা বড় ভয়ানক ব্যাপার, বিশেষ করে গুপ্তধনের নেশা। হুঁশ জ্ঞান হারিয়ে ফেলে মানুষ। সেই নেশায় পেয়েছে তিন কিশোরকে। পাগল হয়ে উঠেছে যেন ওরা। পুরো গুহার প্রতি বর্গ ইঞ্চি জায়গা খুঁজে দেখতে লাগল ওরা। কি ভীষণ বিপদে পড়তে যাচ্ছে, জানতেই পারল না।

স্রোতের টানে আস্তে আস্তে কাছে চলে এসেছে পাপালোর ভাঙা নৌকা। ছেলেদের বেরোনর পথ বন্ধ করে দিয়ে বোতলের মুখে কর্কের ছিপির মত আটকে গেছে সুড়ঙ্গমুখে।

# চোদ্দ

উদ্বিগ্ন হয়ে উঠেছে কিশোর। লাঞ্চের সময় ফেরার কথা, অথচ বিকেল হয়ে গেল, এখনও ফেরেনি রবিন আর মুসা। কোন অঘটন ঘটেনি তো?

ম্যাগাজিনটা টেবিলে রেখে উঠে দাঁড়াল কিশোর। জানালার সামনে এসে দাঁড়াল। উপসাগরের পুরো উত্তর প্রান্তটা চোখে পড়ে এখান থেকে। কিন্তু কই, কোন ছোট পালের নৌকা তো চোখে পড়ছে না!

ঘরে এসে ঢুকল মিসেস ওয়েলটন। হাতে দুধের গ্লাস আর কিছু বিস্কুট। টেবিলে নামিয়ে রাখল।

'নিশ্চয় খিদে পেয়েছে তোমার, কিশোর,' পেছন থেকে বলল বাড়িওয়ালি। 'নাও, এগুলো খেয়ে নাও। রবিন আর মুসা ফেরেনি এখনও?'

'না,' ঘুরে দাঁড়াল কিশোর। 'লাঞ্চের সময়ই ফেরার কথা, এখনও ফিরছে না! কোন বিপদেই পড়েছে মনে হয়!'

'এত ভাবছ কেন?' বলল মিসেস ওয়েলটন। 'হয়ত বড়শি ফেলে মাছ ধরছে। ভুলেই গেছে ফেরার কথা।'

বেরিয়ে গেল বাড়িওয়ালি।

নিশ্চিন্ত হতে পারল না কিশোর। বসে পড়ল টেবিলের সামনে। বিস্কুট চিবোতে চিবোতে ম্যাগাজিনটা টেনে নিল আবার। কঙ্কাল দ্বীপ নিয়ে লেখা ফীচারের জায়গায় জায়গায় পেন্সিল দিয়ে দাগ দিয়েছে। আবার দেখতে লাগল ওগুলো। ভাবনা চলেছে মাথায়।

বাইশ বছর আগে বজ্রপাতে মারা গেছে স্যালি ফ্যারিংটন। সুযোগটা নিয়েছে মেলভিলের পার্কের মালিক। গুজব ছড়িয়ে দিয়েছে স্যালির ভূত দেখা গেছে প্লেজার পার্কে। তারপর? প্রায় বিশ বছর আর ভূতের দেখা নেই। হঠাৎ করেই দেখা দিতে শুরু করেছে আবার বছর দুই আগে থেকে। দেখেছে অশিক্ষিত, কুসংস্কারে ঘোর বিশ্বাসী জেলেরা। তাদের কথায় বিশ্বাস করে কঙ্কাল দ্বীপে লোক যাতায়াত বন্ধ হয়ে গেছে।

এল সিনেমা কোম্পানি। প্লেজার পার্কে কয়েকটা দৃশ্য শূটিং করবে। তাদেরকে উত্যক্ত করা শুরু হল। কেন? দ্বীপে ক্যাম্প করে তারা কার কি ক্ষতি করছে? মালিক বিরূপ নয় তাদের ওপর, তাহলে ভাড়াই দিত না। তাহলে কে?

ঝটকা দিয়ে খুলে গেল দরজা। ভাবনার জগৎ থেকে ফিরে এল কিশোর। ঘরে এসে ঢুকল জোসেফ গ্র্যাহাম। উত্তেজিত।

'কিশোর,' বলল জোসেফ। 'পাপালো হারকুসকে দেখেছ?'

'সকালে দেখেছি,' জবাব দিল কিশোর। 'ওর নৌকায় করে সাঁতার কাটতে গেছে রবিন আর মুসা। ফেরেনি এখনও।'

'সারাদিন পাপালোর সঙ্গে!' প্রায় চেঁচিয়ে উঠল জোসেফ। 'ওরা দু'সেট একোয়ালঙও নিয়ে গেছে! প্র্যাকটিস করবে বলল, দিয়ে দিলাম!' কালো হয়ে গেছে তার মুখ। 'ওই হারামী গ্রেসানটার সঙ্গে গুপ্তধন খুঁজছে না-তো ওরা?'

জবাব দিল না কিশোর। চেয়ে আছে জোসেফের মুখের দিকে। সতর্ক হয়ে উঠেছে।

'ওদেরকে খুঁজতে যাওয়া দরকার।' আবার বলল জোসেফ, 'ওই গ্রেসানের বাচ্চা এমনিতেই যা করেছে, তার ওপর আরও কিছু···' থেমে গেল সে! কিশোরের দিকে তাকাল। 'আমি চললাম খুঁজতে।'

'আমিও যাব,' সর্দি লেগেছে, ভুলে গেল কিশোর। তার এখন ভাবনা, তিন বন্ধুকে খুঁজে বের করা।

'এসো,' বলেই ঘুরে দাঁড়াল জোসেফ।

জেটিতে বাঁধা আছে ছোট একটা মোটর বোট। উঠে বসল জোসেফ আর কিশোর। ইঞ্জিন গর্জে উঠল। ছুটে চলল বোট।

এমনিতেই যা করেছে···কথাটার মানে কি, জানার কৌতূহল হচ্ছে কিশোরের। কিন্তু জিজ্ঞেস করতে পারল না। কথা বলার মেজাজে নেই জোসেফ। থমথমে গম্ভীর মুখ। হুইলে চেপে বসেছে আঙুল।

কঙ্কাল দ্বীপের জেটিতে এসে বোট রাখল জোসেফ। একটা খুঁটির সঙ্গে বেঁধে ফেলল।

'পাঁচজনের জায়গা হবে না এই বোটে,' বলল জোসেফ। 'তাছাড়া সব সরঞ্জাম নিয়ে তৈরি হয়ে যেতে চাই। ডুব দেবার দরকার পড়বে কিনা কে জানে!'

কি ব্যাপার? এত দুশ্চিন্তা কেন জোসেফের?—ভাবল কিশোর। পাপালোর সঙ্গে ডুব দিতে গেছে রবিন আর মুসা, কি হয়েছে তাতে? কোন অঘটন আশা করছে জোসেফ?

পাশের বড় বোটটায় উঠে গেল জোসেফ। কিশোরও উঠল।

গর্জে উঠল বোটের শক্তিশালী ইঞ্জিন। নাক ঘুরিয়ে তীব্র গতিতে ছুটল উপসাগরের পানি কেটে।

প্রথমে পুরো কঙ্কাল দ্বীপের চারপাশে একবার চক্কর দিল জোসেফ। পাপালোর বোটের চিহ্নও নেই। দ্য হ্যাণ্ডের দিকে রওনা দিল সে।

শিগগিরই পৌঁছে গেল দ্য হ্যাণ্ডে। দ্বীপের চারপাশে দু'বার চক্কর দিল।

'নেই,' ইঞ্জিন নিউট্রাল করে বলল জোসেফ। 'কঙ্কাল দ্বীপে নেই, দ্য হ্যাণ্ডে নেই। তারমানে, একটা দিকেই গেছে নৌকাটা। উপসাগরের পুবে। ঠিক, ওদিকেই গেছে।'

চিন্তিত ভঙ্গিতে মাথা ঝোঁকাল কিশোর।

আবার গিয়ার দিল জোসেফ। চলতে শুরু করল বোট। নাক ঘুরে গেল পূর্ব দিকে।

তাকে উঠে বসে আছে রবিন, মুসা আর পাপালো। কোমরের কাছে উঠে এসেছে পানি। আগের চেয়ে দু'ফুট বেড়েছে। পাথুরে দেয়ালে বাড়ি মারছে ছলাৎ-ছল-ছলা ছলাৎ- ছল-ছলা। ধীরে ধীরে কমে আসছে গুহার ভেতরে আলো।

মোহরের নেশায় আর কোন দিকেই খেয়াল নেই তিনজনের। গোটা পঞ্চাশেক মোহর খুঁজে পেয়েছে। কোমরের থলেতে ঢুকিয়ে রেখেছে ওগুলো পাপালো।

জোয়ার এসেছে, প্রথম খেয়াল করল পাপালো। 'চল, বেরিয়ে পড়ি। আর মোহর নেই এখানে।'

'ঠিক,' সায় দিয়ে বলল মুসা। 'গত আধ ঘন্টায় আর একটাও পাইনি। খিদেও লেগেছে। চল, যাই।'

আগে আগে চলল মুসা। সুড়ঙ্গমুখে আটকে থাকা নৌকাটা প্রথম দেখতে পেল সে-ই। ওপরের দিকটা এপাশে। সুড়ঙ্গের ছাতের একটা খাঁজে ঢুকে গেছে মাস্তুলের আগা। বাইরে থেকে ধাক্কা দিচ্ছে স্রোত। শক্ত হয়ে আটকে গেছে নৌকা।

টর্চের আলোয় সব পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছে মুসা। নৌকার চারপাশে ফাঁক নেই বললেই চলে। আটকে গেছে ওরা, বুঝতে অসুবিধে হল না তার।

মুসার পাশে চলে এসেছে রবিন। সামনের দৃশ্য সে-ও দেখল। এগিয়ে গেল দু'জনে। ধাক্কা দিল নৌকার গায়ে। নড়াতে পারল না। পারবেও না, বুঝে গেল।

ঠিক এই সময় ওদের পাশে এসে থামল পাপালো। এক মুহূর্ত চেয়ে রইল নৌকাটার দিকে। বুঝে গেল যা বোঝার। ডিগবাজি খেয়ে ঘুরল। তীরের মত ছুটে চলে গেল গুহার দিকে। তার দম ফুরিয়ে গেছে। গুহায় ফিরে যাওয়া ছাড়া উপায় নেই।

মুসা আর রবিনও খেয়াল করল এতক্ষণে, ট্যাংকে গ্যাস ফুরিয়ে এসেছে। আরেকবার প্রাণপণ চেষ্টা করল নৌকাটা সরানর। ব্যর্থ হয়ে পাপালোর পথ অনুসরণ করল।

মিনিট দুয়েক পর। তাকে বসে আছে তিন কিশোর। কোমর ছাড়িয়ে উঠে এসেছে এখন পানি।

'ভালমত ফাঁদে আটকেছি আমরা!' বলল পাপালো। 'জোয়ার যতই বাড়বে, নৌকাটা আরও শক্ত হয়ে আটকাবে।'

'হ্যাঁ,' বিষণ্ন কণ্ঠে বলল মুসা। 'এমন কাণ্ড ঘটবে, কে জানত?'

'আমি কিন্তু আগেই খেয়াল করেছিলাম,' বলল রবিন। 'স্রোতের টানে ধীরে ধীরে সরে আসছে নৌকাটা। গুরুত্ব দিইনি তখন ব্যাপারটাকে। যা হবার তা-তো হল; এখন কি করব?'

দীর্ঘ নীরবতা। কেউ কোন পরামর্শ দিতে পারল না।

'জোয়ার নামার সময় হয়ত টানের চোটে নেমে যাবে নৌকাটা,' বলল

পাপালো।

'কিন্তু কয়েক ঘন্টা থাকবে জোয়ার!' গুঙিয়ে উঠল মুসা। 'তারপরও যদি নৌকা না নামে?'

'ততক্ষণ আমরা বাঁচব কিনা তাই বা কে জানে!', রবিনের গলায় আতঙ্ক। 'আরও বড় সমস্যা আসছে!'

'কি বললে?' ঝট করে রবিনের দিকে ফিরল পাপালো।

'দেখ!' বলল রবিন। হাতের টর্চের আলো পড়েছে ছাতে। 'ভেজা ভেজা। শেওলা লেগে আছে।'

'তাতে কি?' মুসার প্রশ্ন।

'জোয়ারের সময় ওখানে উঠে যায় পানি,' রবিনের গলা কাঁপছে। 'খাঁচায় ভরে ইঁদুরকে পানিতে চুবিয়ে রাখলে যা হয়, আমাদেরও সেই অবস্থা হবে!'

কারও মুখে কথা নেই আর। গুহার দেয়াল ছলাৎ-ছলাৎ বাড়ি মারছে পানি। ধীরে ধীরে উঠে আসছে ওপরে।

দ্বীপের দিকে চেয়ে হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠল কিশোর, 'মিস্টার গ্র্যাহাম! বোট ফেরান! কি যেন দেখা যাচ্ছে!'

ভুরু কোঁচকাল জোসেফ। কিন্তু বোট ফেরাল।

এক মিনিট পরেই দ্বীপের এক পাশে খুদে সৈকতের ধারে এসে থামল বোট। লাফ দিয়ে নেমে এল কিশোর। ছুটল। চলে এল অন্য পাশে, যেখানে জিনিসগুলো দেখেছিল।

আছে। পাথরের ওপর বিছিয়ে আছে কাপড়। শুকিয়ে এসেছে।

পায়ের আওয়াজ শুনে ফিরে চাইল কিশোর। জোসেফ গ্র্যাহাম আসছে।

'ওদের কাপড়,' বলল কিশোর। 'কাছেপিঠেই নিশ্চয় কোথাও আছে ওরা। দেখি, টিলাটায় চড়ে দেখে আসি আমি।'

ছেলেদের কাপড়গুলোর দিকে চেয়ে আছে জোসেফ। হতবুদ্ধি হয়ে গেছে যেন! কিশোরের দিকে ফিরে চেঁচিয়ে বলল, 'নৌকাটা নেই, আমি শিওর! এখানে কাপড়চোপড় খুলে রেখে কোন কারণে...'

জোসেফের কথা শোনার অপেক্ষা করছে না কিশোর। ছুটে যাচ্ছে টিলার দিকে।

চূড়ায় উঠে এল কিশোর। নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারছে না। কোথাও দেখা যাচ্ছে না নৌকাটা। ধপ করে একটা পাথরের ওপর বসে পড়ল হতাশ ভঙ্গিতে।

পাশে এসে দাঁড়াল জোসেফ। 'পুরো দ্বীপটা দু'বার চক্কর দিয়েছি। দেখিনি ওদের। তারমানে এখানে নেই!' লাথি মারল একটা ছোট পাথরে। ক্ষোভ চাপা দিতে পারছে না।

গড়াতে গড়াতে গিয়ে ছোট একটা গর্তে পড়ল পাথরটা। এক মুহূর্ত পরেই পানিতে পড়ার চাপা শব্দ কানে এল। ব্যাপারটা খেয়াল করল কিনা ওরা, বোঝা গেল না।

'ঠিকই বলেছেন,' উঠে দাঁড়াতে দাঁড়াতে বলল কিশোর। 'পুব উপকূলেই খুঁজতে হবে। কিন্তু কাপড় এখানে ফেলে গেল কেন ওরা!'

'চল,' বলল জোসেফ। 'আগে কোস্ট গার্ডকে খবর দিতে হবে। সাঁঝের বেশি বাকি নেই। অন্ধকার নামার আগেই খুঁজে বের করতে হবে ওদের।'

বোটের দিকে এগিয়ে চলল জোসেফ। অনুসরণ করল কিশোর। চিমটি কাটছে নিচের ঠোঁটে।

'পেয়েছি!' হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠল কিশোর। পাঁই করে ঘুরেই ছুটল টিলার দিকে। ছোট গর্তটার ওপর গিয়ে হুমড়ি খেয়ে পড়ল।

গর্তের মুখের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে চেঁচিয়ে ডাকল, 'মু-সা! রবি-ই-ন! তোমরা আছ ওখানে?' বলেই কান রাখল গর্তের ওপর।

এক মুহূর্ত নীরবতা। বুকের ভেতর ধড়াস ধড়াস করছে কিশোরের। তবে কি ভুল করেছে সে? অনুমান ঠিক হয়নি?

হঠাৎ শোনা গেল জবাব। চাপা, কিন্তু পরিষ্কার। মুসার গলা। 'কিশোর! ফাঁদে আটকে গেছি! তাড়াতাড়ি বের কর আমাদের! জোয়ার এসেছে! পানি আরও বেড়ে গেলে ডুবে মরব। জলদি, জলদি কর! কি-শো-ও-র-র-র...'

# পনেরো

দ্রুত বাড়ছে পানি।

গুহার দেয়ালে জন্মে থাকা জলজ আগাছা আঁকড়ে ধরে আছে ওরা। ঝাঁপাঝাঁপি করছে পানি দেয়ালে দেয়ালে। ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিতে চাইছে ওদেরকে তাক থেকে। আর বেশি বাকি নেই, ছাতে গিয়ে ঠেকবে পানি।

'এত দেরি করছে কেন!' বিড়বিড় করল মুসা। কাঁপছে ঠাণ্ডায়, ভয়ে। তার মনে হচ্ছে, এক যুগ আগে গড়িয়ে পড়েছিল ছোট পাথরটা।

চমকে উঠেছিল ওরা। খানিক পরেই ডাক শোনা গিয়েছিল কিশোরের। বিপদে আছে, জানিয়েছে মুসা। তার মানে সাহায্য আসবেই। কিন্তু আর কত দেরি?

অপেক্ষা ছাড়া করার আর কিছুই নেই। কাজেই অপেক্ষা করতে লাগল ওরা। মাঝে মাঝে টর্চ জ্বেলে দেখে নিচ্ছে, ছাতে পানি ঠেকতে আর কত বাকি! ব্যাটারিও ফুরিয়ে এসেছে। আলোর উজ্জ্বলতা নেই। তবু, অন্ধকারে ম্লান ওই আভাটুকুই সাহায্য করছে অনেক।

'শোন!' হঠাৎ বলল পাপালো। 'মোহর পেয়েছি, এটা ফাঁস করব না আমরা।'

'কেন?' জানতে চাইল রবিন। 'এখানে কি করতে এসেছি, বলতে হবে না?'

'বলব ডুবে ডুবে সাঁতার কাটছিলাম। হঠাৎ নজরে পড়ে গেল গর্তটা! বুঝলাম, সুড়ঙ্গ। ভেতরে কি আছে দেখার জন্যে ঢুকে পড়লাম,' বলল পাপালো। 'মোহর পেয়েছি বললে ফিরে এসে আবার খোঁজার সুযোগ হারাব।'

'হারালে হারাব,' বলল রবিন। 'এখানে দ্বিতীয়বার আর ঢুকতে চাই না আমি। মোহরের বস্তা পড়ে থাকলেও না। যার খুশি এসে নিয়ে যাক।'

'আমারও একই কথা,' সায় দিয়ে বলল মুসা। পাপালোকে বলল, এত ভাবছ কেন? যা মোহর ছিল, সব তুলে নিয়েছি আমরা। আর নেই। জোয়ারের সময় কোনভাবে এসে পড়েছিল হয়ত। ভেব না, সিন্দুক-ফিন্দুক নেই এখানে।'

'তা হয়ত নেই, কিন্তু বালির তলায় আরও মোহর থাকতে পারে,' বোঝানর চেষ্টা করল পাপালো। 'এটাই আমার শেষ সুযোগ। আরেকটা নৌকা কিনতে হবে, বাপকে বাঁচাতে হবে। ক'টা মোহর পেয়েছি? চল্লিশ? পঞ্চাশ? তিন ভাগের এক ভাগ ক'টা হবে? নৌকাই তো কিনতে পারব না।'

'ঠিক আছে,' পাপালোর কথা মেনে নিল রবিন। 'আপাতত ব্যাপারটা ফাঁস করব না আমরা। আরেকবার খুঁজে দেখার সযোগ···'

'মুসা আমান আর আসছে না এই গুহায়!' বাধা দিয়ে বলল গোয়েন্দা সহকারী। 'তুমি আসতে চাইলে আসতে পার, পাপু। কোথায় মোহর পেয়েছি কাউকে না বললেই তো হল।'

'মোহর পেয়েছি, এই কথাটাও গোপন রাখতে চাই এখন,' থলেতে আঙুলের চাপ শক্ত হল পাপালোর। 'একবার কেন, আরও দশবার আসতেও ভয় পাব না আমি। কপাল খারাপ তাই বিপদে পড়ে গেছি। কে ভাবতে পেরেছিল, সুড়ঙ্গমুখে এসে নৌকা আটকাবে? এমন ঘটনা সব সময় ঘটে না।'

'জোসেফ আর কিশোর কতখানি কি করছে, কে জানে!' গুঙিয়ে উঠল মুসা। 'কোস্ট গার্ডকে খবর দিতে গিয়ে থাকলেই সেরেছে। ফিরে এসে আর পাবে না আমাদেরকে।'

'নৌকাটাকে সরাতে শক্তি দরকার,' বলল রবিন। 'ভেঙে ফেলতে হবে, কিংবা শাবল দিয়ে চাড় মেরে বের করে নিতে হবে।'

'অনেক সময় লেগে যাবে তাতে,' ঢেউয়ের ধাক্কায় কাত হয়ে গেল মুসা। আগাছা আঁকড়ে ধরে সামলে নিল। 'তাক থেকেই ফেলে দেবে দেখছি!···হ্যাঁ, যা বলছিলাম। কমসে কম দু'ঘন্টা তো লাগবেই। ততক্ষণে আমরা শেষ!'

'কিশোর জেনেছে আমরা এখানে আছি,' নিরাশ হচ্ছে না রবিন। 'কিছু একটা ব্যবস্থা করে ফেলবেই ও। ঠিক বের করে নিয়ে যাবে আমাদের, দেখ।'

'সেই প্রার্থনাই কর,' নিচু গলায় বলল পাপালো।

*

মুসার কাছ থেকে সাড়া পাবার পর মাত্র পনেরো মিনিট পেরিয়েছে।

তীর থেকে শ'খানেক ফুট দূরে ভাসছে এখন মোটর বোট। ইঞ্জিন নিউট্রাল। হাল ধরেছে কিশোর। জোসেফ ডুবুরির পোশাক পরছে।

'পাগলামির সীমা থাকা উচিত!' আপনমনেই বিড়বিড় করল জোসেফ। ওয়েট বেল্ট আঁটল কোমরে। বোটের কিনারে গিয়ে দাঁড়াল। ফিরে চাইল। 'এখানেই থাক। পরিস্থিতি দেখে আসি আমি। কোস্ট গার্ডকে খবর দেয়ার সময় আছে কিনা কে জানে!' ফেস মাস্ক টেনে দিল সে। একটা আণ্ডারওয়াটার টর্চ হাতে নিয়ে নেমে গেল পানিতে।

বড় একা একা লাগছে কিশোরের। দক্ষিণে অনেক দূরে এক সারি নৌকা, মাছ ধরা শেষ করে ফিরে চলেছে ফিশিংপোর্টে। এদিকে কেউ আসবে না। গুহায় আটকা পড়ে মরতে বসেছে তিন বন্ধু। ওদেরকে কি উদ্ধার করতে পারবে শেষ পর্যন্ত? মুসা যা বলল, সুড়ঙ্গমুখে বেশ শক্ত করেই আটকেছে ভাঙা নৌকা।

অতি ধীরে গড়িয়ে গড়িয়ে যাচ্ছে যেন সময়। কিশোরের মনে হল এক ঘন্টা পেরিয়ে গেছে। ঘড়ির দিকে চেয়ে দেখল, জোসেফ গেছে মাত্র পাঁচ মিনিট আগে। আরও পাঁচ মিনিট পরে ভেসে উঠল জোসেফের মাস্কে ঢাকা মুখ। দ্রুত উঠে এল সে বোটে। মাস্ক সরাল মুখ থেকে। চেহারা ফ্যাকাসে, উদ্বিগ্ন।

'সাংঘাতিক শক্ত হয়ে আটকেছে!' বলল জোসেফ। 'কোথাও ধরে যে টান দেব, সে জায়গাই নেই। কোস্ট গার্ডকেই খবর দিতে হবে। শাবল কিংবা ক্রো-বার ছাড়া হবে না।'

জোসেফের মুখের দিকে চেয়ে আছে কিশোর। 'তাতে তো অনেক সময় লাগবে! কমপক্ষে দু'ঘন্টা!'

আস্তে মাথা ঝোঁকাল জোসেফ। 'তা-তো লাগবেই। কিন্তু আর কি করার আছে? বড় কোন গর্ত নেই টিলার। থাকলে ও পথে দড়ি নামিয়ে দিয়ে টেনে তোলা যেত।'

জোসেফের কথা কানে ঢুকছে কিনা কিশোরের, বোঝা গেল না। নিচের ঠোঁটে চিমটি কাটছে সে।

'মিস্টার গ্র্যাহাম!' হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠল কিশোর। 'নৌকাটাকে টেনে বের করে আনলেই হয়!'

'টেনে বের করব!' ভুরু কুঁচকে গেল জোসেফের। 'কি করে?'

'মোটর বোটের সাহায্যে,' বলল কিশোর। 'খুব শক্তিশালী ইঞ্জিন এই বোটটার। নোঙরের দড়িও অনেক লম্বা। নোঙরের একটা আঁকশি নৌকায় গেঁথে...'

'কিশোর, তুমি একটা জিনিয়াস!' চেঁচিয়ে উঠল জোসেফ। 'ঠিক বলছ! এখুনি যাচ্ছি আমি!'

দ্রুত হাত চালাল জোসেফ। ক্যাপস্ট্যান থেকে খুলে আনল দড়িসহ নোঙর। দড়ির অন্য মাথা বাঁধল বোটের পেছনের একটা রিঙবোল্টে। পানিতে ছুঁড়ে ফেলে

দিল নোঙর।

'আমি যাচ্ছি,' বলল জোসেফ। 'দড়ি ধরে তিনবার টানব। ফার্স্টগিয়ারে দিয়ে আস্তে আস্তে জোর বাড়াবে। নৌকাটা সুড়ঙ্গমুখ থেকে খসে এলে বুঝতেই পারবে। থেমে যাবে তখন। গুহায় ঢুকে ওদেরকে বের করে আনব আমি।...আর হ্যাঁ, টানতে টানতে হঠাৎ যদি সামনে লাফ দিয়ে ছুটতে শুরু করে বোট, বুঝবে, নৌকা থেকে নোঙর খসে গেছে। এখানে নিয়ে আসবে আবার বোট। আমার ওঠার অপেক্ষা করবে। ঠিক আছে?'

মাথা ঝোঁকাল কিশোর।

নেমে গেল জোসেফ।

আবার অপেক্ষার পালা। দড়ি ধরে বসে রইল কিশোর। দুরুদুরু করছে বুকের ভেতর। একবার টান পড়ল দড়িতে। নোঙর গাঁথছে হয়ত জোসেফ। এক মিনিট কাটল...দুই মিনিট...হঠাৎ টান পড়ল দড়িতে। জোরে জোরে, তিন বার।

লাফ দিয়ে উঠে এল কিশোর। ড্রাইভিং সিটে বসেই গিয়ার দিল। ধীরে ধীরে চলতে শুরু করল বোট। তারপর থেমে গেল হঠাৎ করেই। টান টান হয়ে গেছে দড়ি।

এক্সিলেটরে চাপ বাড়াচ্ছে কিশোর। হুইলে হাতের আঙুল চেপে বসেছে। নোঙর বাঁধা দড়ির মতই টান টান হয়ে গেছে তার স্নায়ু। গর্জন বাড়ছে শক্তিশালী ইঞ্জিনের।

প্রথম কয়েক মুহূর্ত কিছুই ঘটল না। তারপর সামনে বাড়তে লাগল বোট, ধীরে, অতি ধীরে। এক ইঞ্চি দু'ইঞ্চি করে। বিশাল মরা তিমিকে টেনে নিয়ে যেতে চাইছে যেন টাগবোট। হঠাৎ সামনে লাফ দিল বোট। সেরেছে!—ভাবল কিশোর। গেছে হয়ত ছুটে। কিন্তু না, যতখানি জোরে ছোটা উচিত তত জোরে এগোচ্ছে না তো বোট! তারমানে নৌকাটা আটকে আছে নোঙরে। ওটাকে টেনে নিয়ে চলেছে বোট। বিশ ফুট...পঞ্চাশ ফুট একশো ফুট দূরে গিয়ে ইঞ্জিন নিউট্রাল করে দিল কিশোর। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই থেমে দাঁড়াল বোটটা।

সিট থেকে উঠে পেছনে চলে এল কিশোর। কোমরের বেল্ট থেকে ছুরি খুলে নিয়ে কেটে নিল দড়ি। ফিরে এসে বসল আবার ড্রাইভিং সিটে।

আবার আগের জায়গায় বোট ফিরিয়ে নিয়ে এল কিশোর। অপেক্ষা করতে লাগল। এক মিনিট...দুই মিনিট...ভুসস করে বোটের পাশেই ভেসে উঠল একটা মাথা। জোরে শব্দ করে শ্বাস নিল পাপালো হারকুস। বোটের গা ঘেঁষে এল। থলেটা ছুঁড়ে দিল ভেতরে। চেঁচিয়ে বলল, 'জলদি লুকাও ওটা! ভেতরে মোহর! কারও কাছে ফাঁস করা চলবে না এখন!'

হাত ধরে আগে পাপালোকে বোটে উঠতে সাহায্য করল কিশোর। তারপর ভেজা থলেটা তুলে নিয়ে সিটে রেখে ওটার ওপরেই বসে পড়ল। লুকানর এর চেয়ে ভাল জায়গা আর নেই বোটে।

কিছু একটা বলতে যাচ্ছিল পাপালো, এই সময় ভেসে উঠল রবিন। পরক্ষণেই মুসা। দু'জনকে উঠতে সাহায্য করল কিশোর আর পাপালো।

'যাক, উদ্ধার করলে শেষ পর্যন্ত!' স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল মুসা। 'বাঁচার আশা ছিলই না!'

'জোসেফের ভাবভঙ্গিতে মনে হল, খুব খেপে গেছে,' বলল রবিন।

'সব শুনলে বাবাও খেপবে!' কথার ধরনেই বোঝা গেল, ভয় পাচ্ছে মুসা। 'তবে যা-ই হোক, কিছু মোহর পেয়েছি। পাপু বলেনি?'

'থলেটার ওপরই বসে আছি,' বলল কিশোর। 'এখন মোহরের কথা থাক। পরে সব শুনব।'

'কাজটা খুব খারাপ হয়ে গেছে,' পিঠে বাঁধা গ্যাস ট্যাংক খুলতে খুলতে বলল রবিন। 'কিন্তু দোষ আমাদের নয়। পাপুর নৌকাটাকে ধাক্কা দিয়ে ভেঙে...'

'চুপ! রবিনকে থামিয়ে দিল কিশোর। 'জোসেফ। সব জানানর দরকার নেই ওকে। রেখেঢেকে বলবে।'

বোটের পাশে ভেসে উঠেছে জোসেফ। এক হাতে দড়ির কাটা প্রান্ত। বাড়িয়ে দিল ওটা। ধরল কিশোর। বেঁধে দিল ক্যাপস্টানের সঙ্গে। তাড়াতাড়ি এসে বসল আবার সিটে।

বোটে উঠে এল জোসেফ। ধীরে সুস্থে খুলে নিল ফেস মাস্ক, ফ্লিপার, গ্যাস ট্যাংক।

নীরবে অপেক্ষা করছে ছেলেরা। ওদের দিকে তাকাল জোসেফ। 'তারপর? খুব তো দেখালে!'

'আমরা...' শুরু করেও থেমে গেল রবিন।

হাত তুলেছে জোসেফ। 'আর সাফাই গাইতে হবে না,' বলল সে। 'যা করার করেছ। তবে তোমাদের ড্রাইভিং এখানেই শেষ। গোয়েন্দাগিরিও। মিস্টার আমানও তাই বললেন। শুরু থেকেই আমার মত ছিল না। বাচ্চাকাচ্চা দিয়ে কাজ হবে না কিছুই। শুধু শুধু বাড়তি ঝামেলা!'

নীরব রইল ছেলেরা।

পাপালোর দিকে ফিরল জোসেফ। 'তারপর? চোরের কি খবর? অনেক হারামীপনা করেছ, এবার জেল খাটগে।'

জোসেফ কি বলছে, কিছুই বুঝতে পারল না ছেলেরা।

'হাঁ করে আছ কেন?' পাপালোর দিকে চেয়ে বলল জোসেফ। 'গতরাতে একটা ট্রেলারের জানালা ভাঙা হয়েছে। ছোট ফোকর। বড় মানুষ ঢুকতে পারবে না ওই ফোকর দিয়ে, গোটা দুয়েক দামি লেন্স চুরি গেছে। কম করে হলেও হাজার ডলার দাম। ভুল করে একটা ছুরি ফেলে গেছে চোর।' স্থির চোখে পাপালোর দিকে তাকিয়ে আছে সে। 'ছুরিটা কার, জান? তোমার! আর জানালার ওই ফোকর দিয়ে তোমার পক্ষেই ঢোকা সম্ভব।'

বোবা হয়ে গেছে যেন চার কিশোর। হাঁ করে চেয়ে আছে জোসেফের দিকে।

'তোমার শয়তানী খতম,' বলল জোসেফ। 'হোভারসনকে খবর দেয়া হয়েছে। ফিশিংপোর্টে ফিরে গিয়েই তার দেখা পাবে। কপালে তোমার অনেক দুঃখ আছে, পাপালো হ্যারকুস, এই বলে দিলাম।'

# ষোলো

'পাপুকে পুলিশে দিল ওরা!' বিষণ্ণ কণ্ঠে বলল রবিন। 'কাজটা উচিত হয়নি।'

'হ্যাঁ,' আস্তে মাথা দোলাল মুসা। 'আমার কিন্তু এখনও বিশ্বাস হচ্ছে না, লেন্সগুলো ও চুরি করেছে। কিশোর, তুমি কি বল?'

কোন জবাব দিল না গোয়েন্দাপ্রধান, যেন শুনতেই পায়নি। দুই বন্ধুর কাছ থেকে দূরে, লিভিং রুমের আরেক প্রান্তে সোফায় বসে আছে। গভীর চিন্তায় মগ্ন।

বিকেলের মাঝামাঝি। বাইরে ঝমাঝম বৃষ্টি। সারাদিন বাইরে বেরুতে পারেনি ওরা। বৃষ্টি না থাকলেও অবশ্য পারত না। মিস্টার আমানের কড়া নির্দেশঃ একা কোথাও যেতে পারবে না ওরা। যেতে হলে তাঁকে জানাতে হবে। লোক সঙ্গে দিয়ে দেবেন। গতকাল বিকেলে ছেলেদের অবাধ্যতার ওপর এক কড়া বক্তৃতা দিয়েছেন তিনি। আন্তরিক দুঃখিত হয়েছেন ওদের কাজে, সেটাও জানিয়েছেন বার বার।

'কিশোর!' গলা চড়িয়ে ডাকল মুসা। 'কি বলছি, শুনছ? আমার ধারণা, লেন্স পাপু চুরি করেনি। তুমি কি বল?'

কেশে উঠল কিশোর। এখনও পুরোপুরি যায়নি সর্দি।

'না,' বলল গোয়েন্দাপ্রধান, 'পাপু চুরি করেনি। সাক্ষী প্রমাণ সব ওর বিরুদ্ধেই যাচ্ছে যদিও। ওর ছুরি পাওয়া গেছে ট্রেলারের ভেতর, তাজ্জব কাণ্ড!'

'দুই দিন আগে হারিয়েছিল ওটা,' বলল রবিন। 'ও তাই বলেছে।'

'এখন কেউ বিশ্বাস করবে না একথা,' বলেই আবার কাশতে লাগল কিশোর। কাশি থামলে বলল, 'ধরেই নিয়েছে সিনেমা কোম্পানি, তাদের সমস্যা শেষ। চোর ধরা পড়েছে, আর কি?'

'কঙ্কাল দ্বীপের রহস্যটা আসলে কি?' জিজ্ঞেস করল রবিন। 'অনুমান করেছ কিছু?'

'কেউ একজন চায় না, কঙ্কাল দ্বীপে লোক যাতায়াত করুক, কিংবা বাস করুক,' বলল কিশোর। 'এ-ব্যাপারে আমি শিওর। কিন্তু কেন চায় না, বুঝতে পারছি না এখনও।'

দরজায় টোকা পড়ল। সাড়া দিল মিসেস ওয়েলটন। দরজা খুলে ভেতরে ঢুকল। পেছনে পুলিশ চীফ হোভারসন। রেনকোট থেকে পানি ঝরছে।

'এই যে, ছেলেরা,' বলল বাড়িওয়ালি, 'চীফ কথা বলতে চান তোমাদের

সঙ্গে।'

'মিসেস ওয়েলটন,' বলল হোভারসন, 'ওদের সঙ্গে একটু একা কথা বলতে চাই, প্লীজ...'

'ওহ্, শিওর শিওর,' দরজা ভেজিয়ে দিয়ে বেরিয়ে গেল মিসেস ওয়েলটন।

রেনকোটটা খুলে দরজার পাশের হ্যাঙ্গারে ঝুলিয়ে রাখলেন চীফ। সোফায় বসলেন। সিগারেট বের করে ধরালেন ধীরেসুস্থে।

'তারপর, ছেলেরা,' কথা শুরু করলেন হোভারসন, 'পাপুর পজিশন খুব খারাপ। লেন্স দুটো পাওয়া গেছে। ওর বিছানার তলায়।'

'কিন্তু পাপু চুরি করেনি।' রাগ প্রকাশ পেল রবিনের গলায়। 'আমরা জানি, ও করেনি!'

'হয়ত করেনি,' মাথা ঝোঁকালেন হোভারসন। 'কিন্তু সব সাক্ষী-প্রমাণ ওর বিরুদ্ধে যাচ্ছে। সবাই জানে, বাবার চিকিৎসার জন্যে গ্রীসে ফিরে যাবার জন্যে, পাগল হয়ে উঠেছে ও।'

'উঠেছে, ঠিক,' বলল মুসা। 'কিন্তু সেজন্যে চুরি করবে না সে। তাছাড়া টাকা তার আছে। এবং আরও পাবার সম্ভাবনা আছে।'

'তাই!' তিনজনের দিকেই একবার করে তাকালেন হোভারসন। 'ওর টাকা আছে? আরও পাবার সম্ভাবনা আছে! কি করে?'

মুখ ফসকে কথা বেশি বলে ফেলেছে, এখন আর ফেরার পথ নেই। মোহরের কথা বলতেই হবে চীফকে। তবু চুপ করে রইল মুসা।

'ছেলেরা,' আবার বললেন হোভারসন, 'পাপুকে আমি পছন্দ করি, তার ভাল চাই। এখন বলত, সত্যি সত্যি কি ঘটেছিল গতকাল। বিপদে পড়েছ, এবং উদ্ধার করে আনা হয়েছে, ঠিকই। কিন্তু কেন পড়েছ বিপদে? কেন গিয়ে ঢুকেছ ওই সুড়ঙ্গে। শুধুই কৌতূহল? নিশ্চয় না। হয়ত তোমাদের ভয়, গুপ্তধনের কথা ফাঁস হয়ে গেলে দলে দলে ছুটে আসবে লোক। শূটিঙে বিঘ্ন ঘটাবে। কিন্তু পাপুর দিকটাও তো ভেবে দেখতে হবে তোমাদের। ওকে হাজত থেকে বের করে আনতে চাও না?'

দ্বিধা করছে তিন গোয়েন্দা। শেষে মন স্থির করে নিল কিশোর। 'হ্যাঁ, স্যার, চাই।' মুসার দিকে ফিরল। 'থলেটা নিয়ে এসো।'

দোতলায় চলে গেল মুসা। পাপালোর থলেটা নিয়ে ফিরে এল। থলের মুখ খুলে হোভারসনের পাশে ঢেলে দিল মোহরগুলো। মৃদু টুংটাং আওয়াজ তুলে সোফায় পড়ল পঁয়তাল্লিশটা স্প্যানিশ ডাবলুন।

বড় বড় হয়ে গেল হোভারসনের চোখ। 'মাই গড! জলদস্যুর গুপ্তধন। পাপু পেয়েছে?'

'পাপু, মুসা আর রবিন,' বলল কিশোর। 'দ্য হ্যাণ্ডের গুহায়। ফিরে গিয়ে আরও খোঁজার ইচ্ছে আছে পাপালোর। সেজন্যেই গোপন রেখেছি ব্যাপারটা।'

'হুমম!' ঝট করে চোখ তুললেন হোভারসন। 'আমিও তোমাদের দলে। মোহর পেয়েছ, কাউকে বলব না।'

'তাহলে বুঝতেই পারছেন, স্যার,' আগের কথার খেই ধরল রবিন, 'টাকার জন্যে চুরি করার দরকার নেই পাপুর।'

'কিন্তু,' বললেন হোভারসন, 'তাতে প্রমাণ হয় না, পাপু চুরি করেনি। মোহরগুলো পাওয়া গেছে লেন্স চুরি যাবার পর। পাপালো তখন জানত না, মোহর পাবে।'

ঠিকই বলেছেন পুলিশ চীফ। মুখ কালো করে ফেলল আবার রবিন। সজোরে পকেটে হাত ঢোকাল মুসা।

রুমাল বের করে নাক মুছল কিশোর। তারপর বলল, 'রাফাত চাচা, মিস্টার সিমনস আর মিস্টার গ্র্যাহামের ধারণা স্কেলিটন আইল্যাণ্ডের রহস্যের সমাধান হয়ে গেছে। তাঁরা মনে করছেন, যত নষ্টের মূলে ছিল ওই পাপু। কিন্তু, তাঁরা ভুল করছেন। সমস্ত শয়তানীর পেছনে রয়েছে অন্য কেউ। ঘটনাগুলো সব খতিয়ে দেখলেই অনেক কিছু পরিষ্কার হয়ে যায়। গোড়া থেকেই শুরু করছি...' কেশে উঠল সে।

'আপনি সবই জানেন,' কাশি থামলে বলল কিশোর, 'তবু গোড়া থেকেই শুরু করছি। মাঝে অনেক দিন বিরতি দিয়ে, হঠাৎ করে আবার স্কেলিটন আইল্যাণ্ডে ভূতের উপদ্রব শুরু হল কেন? সিনেমা কোম্পানির ওপর ওই বিশেষ নজর কেন চোরের? প্লেন থেকে নামতে না নামতে কার কি এমন ক্ষতি করে ফেললাম, যে ঝড়ের রাতে দ্য হ্যাণ্ডে নির্বাসন দিয়ে আসা হল আমাদেরকে? সবগুলো প্রশ্নের একটাই সহজ উত্তরঃ কেউ একজন চায় না, স্কেলিটন আইল্যাণ্ডে লোক যাতায়ত করুক, কিংবা বাস করুক, কিংবা ওটার ব্যাপারে খোঁজখবর করুক। এবং সেটার প্রমাণও পেয়েছি গতকাল বিকেলে। ডাক্তার রোজারের চেম্বার থেকে ফিরছিলাম, হঠাৎ পাশের গলি থেকে বেরিয়ে এল একজন লোক। ঢেঙা, রোগাটে, হাতে উল্কি দিয়ে আঁকা জলকুমারীর ছবি...'

'ডিক।' চোয়ালে হাত ঘষছেন চীফ। 'ডিক ফিশার! মাত্র জেল থেকে বেরোল ব্যাটা, এরই মাঝে শুরু করে দিল!...ঠিক আছে, বলে যাও।'

'দ্বীপগুলোর আশপাশে খুব বেশি ঘোরাফেরা করে পাপু, তাই তার নৌকা ভেঙে দেয়া হল,' বলল কিশোর। 'শুধু তাই না, চক্রান্ত করে তাকে জেলে পাঠানর ব্যবস্থা করল।'

'কিন্তু কেন?' প্রশ্ন করল রবিন।

'সেটাই বুঝতে পারছি না,' বলল কিশোর। 'তাহলে সব রহস্যেরই সমাধান হয়ে যেত।'

'হুঁ-হ্!' চিন্তিত দেখাচ্ছে হোভারসনকে। 'ব্যাপারটা ভাল করে ভেবে দেখব। এখন আমি উঠি। দেখি, পাপুর কোন ব্যবস্থা করা যায় কিনা। হাক স্টিভেন ওর

জামিন হতে রাজি আছে। কাগজপত্র তৈরি করতেও দেরি হবে না। জজ সাহেব একটা কাজে বাইরে গেছেন। তিনি ফিরে এলেই সই করিয়ে নেয়া যায়। হ্যাঁ, আমাকে না জানিয়ে কোন কিছু করে বোসো না। বিপদে পড়ে যেতে পার। চলি, গুড বাই।'

বেরিয়ে গেলেন হোভারসন।

তাড়াতাড়ি আবার মোহরগুলো থলেতে ভরে নিল মুসা। মুখ বেঁধে নিয়ে গিয়ে রেখে এল দোতলায়, নিজেদের ঘরে, সুটকেসে। ফিরে এল নিচের ঘরে।

ঘরে ঢুকল মিসেস ওয়েলটন। খাবার দেবে কিনা জানতে চাইল। দিতে বলল ছেলেরা।

টেবিলে খাবার দেয়া হল। খেতে বসল ছেলেরা। কাছেই একটা চেয়ারে বসে এটা ওটা বাড়িয়ে দিচ্ছে মিসেস ওয়েলটন। বলি বলি করছে কি যেন। শেষ পর্যন্ত আর থাকতে না পেরে বলেই ফেলল, 'গুপ্তধন খোঁজার জন্যেই তাহলে এসেছ তোমরা। দেখলাম...'

ঝট করে মাথা তুলল কিশোর। 'কি দেখেছেন?'

'সত্যি বলছি, চুরি করে কারও কিছু দেখার অভ্যেস নেই আমার। দেখতে এসেছিলাম, চীফ চলে গিয়েছে কিনা। দেখলাম, বসে আছে, পাশে একগাদা ভাবলুন। ভাবলাম, খুব জরুরী কোন কথা আলোচনা করছ তোমরা। বিরক্ত না করে চলে গেলাম।'

একে অন্যের দিকে চাওয়া-চাওয়ি করল তিন গোয়েন্দা। খাওয়া বন্ধ।

'কাউকে বলেছেন একথা?' জিজ্ঞেস করল কিশোর।

'কোন্ কথা?'

'আমরা গুপ্তধন খুঁজে পেয়েছি...'

'নাহ্,' এদিক ওদিক মাথা নাড়ল মিসেস ওয়েলটন, 'তেমন কাউকে না। ফোনে শুধু আমার ঘনিষ্ঠ তিন বান্ধবীকে জানিয়েছে। আমারই মত কম কথা বলে। পেটে বোমা মারলেও আমারই মত মুখে তালা লাগিয়ে রাখবে। কাউকে কিচ্ছু বলবে না...'

'হুঁ,' চিন্তিত ভঙ্গিতে মাথা ঝোঁকাল কিশোর। 'কয়েকটা মোহর পেয়েছে মুসা আর রবিন। তবে স্কেলিটন আইল্যাণ্ডে নয়।'

'আমাকে বোকা বানাতে পারবে না, ইয়ং ম্যান,' নিজের বুদ্ধির ওপর খুব বেশি ভক্তি মিসেস ওয়েলটনের। 'আগামী কাল ভোর থেকেই লোক যেতে শুরু করবে স্কেলিটন আইল্যাণ্ডে। গুপ্তধন খুঁজতে...' বলতে গিয়েই থেমে গেল। মনে পড়ে গেছে, একটু আগে বান্ধবীদের প্রশংসা করে বলেছে, মুখে তালা লাগিয়ে রাখবে ওরা। কথা ঘোরানর চেষ্টা করল, 'মানে, আমি বলতে চাইছি, যদি আর কেউ শুনে ফেলে আর কি! চীফ হোভারসনও তো জেনে গেল...'

'তিনি কাউকে বলবেন না, কথা দিয়েছেন,' বলল কিশোর।

'ওহ্, আমি যাই!' তাড়াতাড়ি উঠে পড়ল মিসেস ওয়েলটন। 'দুধ পুড়ে যাচ্ছে...'

'কাম সারছে!' কিশোরের মুখে শোনা বাঙালি বুলি ঝাড়ল মুসা। 'এতক্ষণে জেনে গেছে হয়ত আদ্দেক শহর! আগামী কাল ভোর হতে না হতেই ভিড় লেগে যাবে কঙ্কাল দ্বীপে। শূটিঙের বারোটা বাজল! সব দোষ আমাদের!'

'এরপর রাফাত চাচাকে মুখ দেখাব কি করে আমরা!' বলল রবিন।

'লোক ঠেকাতে না পারলে সর্বনাশ হয়ে যাবে ফিল্ম কোম্পানির!' বলল মুসা। 'কিশোর, তুমি কিছু বল।'

চুপচাপ খেয়ে যাচ্ছে কিশোর। নির্লিপ্ত। মুখ তুলল, 'একটা বুদ্ধি এসেছে আমার মাথায়। আগে খেয়ে নিই, তারপর বলছি। তোমরাও খেয়ে নাও।'

শেষ হল খাওয়া। হাতমুখ ধুয়ে এসে বসল আবার আগের জায়গায়।

'কি বুদ্ধি, বল,' জানতে চাইল মুসা।

খুলে গেল দরজা। ঘরে এসে ঢুকলেন মিস্টার আমান, পেছনে পিটার সিমনস।

মিস্টার আমান জানালেন, আগামী সকালেই এসে পৌঁছুবেন পরিচালক জন নেবার। এসকেপ ছবির শূটিং শুরু হবে।

আঁতকে উঠল মুসা আর রবিন।

কিশোর নির্লিপ্ত। ধীরে ধীরে জানাল, কি ঘটেছে। আগামী কাল সকালে কি ঝামেলায় পড়তে যাচ্ছে সিনেমা কোম্পানি।

মুখ কালো হয়ে গেল পিটার সিমনসের।

'গেল, সব সর্বনাশ হয়ে গেল!' প্রায় চেঁচিয়ে উঠলেন মিস্টার আমান। 'পঙ্গপালের মত ঝাঁপিয়ে পড়বে গুপ্তধন শিকারির দল! বলে কাউকে বোঝাতে পারব না, মোহর নেই কঙ্কাল দ্বীপে।'

'বলে বোঝানর দরকার কি?' বলল কিশোর।

ভুরু কুঁচকে গেছে, হাঁ করে কিশোরের দিকে তাকিয়ে আছেন মিস্টার আমান। 'কি বলছ তুমি!'

'একটা বুদ্ধি এসেছে মাথায়,' বলল কিশোর। 'এক কাজ করলেই তো হয়। গুপ্তধন শিকারিদের ছবি তুলে নিন। কোথায় খুঁজছে, কি করছে না করছে, সব। ট্রেজার হান্টার নাম দিয়ে কম দৈর্ঘ্যের একটা ছবি বানিয়ে ফেলুন। ভাড়া করে লোক এনে গুপ্তধন খোঁজার ছবি বানানো সম্ভব, কিন্তু এত নিখুঁত, এত জ্যান্ত হবে না।'

কি যেন ভাবল সিমনস। বলল, 'ঠিকই বলেছ। শুধু এভাবেই গুপ্তধন শিকারিদের হাত থেকে নিস্তার পাব আমরা। ডাক্তার রোজারকে বলে পাঠাব, স্থানীয় রেডিওতে গিয়ে ঘোষণা করুক, আগামী কাল গুপ্তধন খোঁজা চলবে ব্যাপক হারে। 'যে গুপ্তধন খুঁজে পাবে, পাঁচশো ডলার পুরস্কার পাবে সে আমাদের

কোম্পানির কাছ থেকে। তবে, একটা শর্ত থাকবে, নাগরদোলা সাগরদোলার কোন ক্ষতি করতে পারবে না। খুঁজেপেতে কিছুই না পেয়ে চলে যাবে ওরা। বুঝে যাবে, কোন গোপন ম্যাপ পাইনি আমরা, গুপ্তধন খুঁজতে আসিনি। তাহলে এভাবে লোককে আমন্ত্রিত করতাম না। আর কখনও আমাদের বিরক্ত করতে আসবে না ওরা। নিরাপদে এসকেপ ছবির শূটিং চালিয়ে যেতে পারব। মাঝে থেকে গুপ্তধন শিকারের ওপর চমৎকার একটা ছবিও তৈরি হয়ে যাবে। খুব ভাল বুদ্ধি!'

'হুঁ-উঁ!' ধীরে মাথা ঝোঁকালেন মিস্টার আমান! 'ঠিকই। তাহলে এখুনি ফোন করে সব কথা জানানো উচিত মিস্টার নেবারকে। তিন গোয়েন্দার দিকে ফিরলেন। 'রাত অনেক হয়েছে। আর জেগে থেক না। শুতে যাও। সকালে উঠে দেখতে পাবে খেলা...'

'কিন্তু বাবা, পাপু...' বলতে গিয়ে বাধা পেল মুসা।

'ওই চোরটার কিছু শিক্ষা হওয়া দরকার,' উঠে দাঁড়ালেন মিস্টার আমান। 'পিটার, চল যাই। ডাক্তার রোজারকেও খবর পাঠাতে হবে...'

তাড়াহুড়ো করে বেরিয়ে গেল দু'জনে।

'উফ্ফ! বাঁচলাম!' আরাম করে হেলান দিয়ে বসল মুসা। 'কি ঘাবড়েই না গিয়েছিলাম! কিন্তু পাপুর ব্যাপারটা কি হবে? কানই দিল না বাবা!'

বড়রা ছোটদের কথায় কান দেয় না, এটাই নিয়ম,' ক্ষোভ প্রকাশ পেল রবিনের কথায়। 'তারা যা ভাবে, সেটাই ঠিক, আমাদের কথা কিছু না...। যাকগে, কিশোরের কথায় কান দিয়েছে ওরা, এটাই বাঁচোয়া আমি তো কোন উপায়ই দেখছিলাম না...তুমি আবার কি ভাবতে শুরু করেছ, কিশোর...'

'অত বেশি ভেব না,' হাসল মুসা। 'মগজটাকে একটু বিশ্রাম দাও। নইলে বেয়ারিং জ্বলে যাবে...'

কেশে উঠল কিশোর। থামল। স্বস্তি ফুটেছে চেহারায়।

'কি, কিশোর?' জিজ্ঞেস করল রবিন। 'প্রশ্নের জবাব পেয়ে গেছ মনে হচ্ছে?'

'হস্তে মোহরগুলো কি করে গেল, মনে হয় বুঝতে পারছি,' শান্ত কণ্ঠে বলল কিশোর।

'পারছ!' চেঁচিয়ে উঠল মুসা। 'বলে ফেল! জলদি!'

'চল, ওপরে চলে যাই,' বলল কিশোর।

কিশোরের পিছু পিছু দোতলায় শোবার ঘরে এসে ঢুকল দুই সহকারী গোয়েন্দা। উত্তেজিত।

'বল এবার,' ঘরে ঢুকেই বলে উঠল রবিন।

নিজের বিছানায় গিয়ে বসল কিশোর। 'ক্যাপ্টেন এক কান-কাটা কোথায় ধরা পড়েছিল, মনে আছে? হস্তে। মোহরগুলো রেখে খালি সিন্দুকটা উপসাগরে ফেলে দিয়েছিল সে। দ্বীপে গিয়ে উঠেছিল। তারপর টিলার ওপরের গর্ত দিয়ে সব মোহর ফেলে দিয়েছিল নিচের গুহায়। এজন্যেই একটা মোহরও খুঁজে পায়নি

ব্রিটিশ যুদ্ধ-জাহাজের ক্যাপ্টেন।'

'তাহলে আরও অনেক মোহর আছে গুহায়!' উত্তেজনায় কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম দেখা দিয়েছে মুসার। 'পাপুর কথাই ঠিক!'

'মনে হয় না,' মাথা নাড়ল কিশোর। 'তিনশো বছর ধরে জোয়ার আসছে গুহায়। নিশ্চয় বেশির ভাগ মোহরই বের করে নিয়ে গেছে খোলা সাগরে। ওপরে যা ছিল, পেয়ে গেছ। আর কিছু থাকলেও, বালির অনেক গভীরে ঢুকে গেছে ওগুলো। খুঁজে পাওয়া কঠিন।

'চেপে রাখা শ্বাসটা ফেলল মুসা। 'ঠিকই বলেছ। তবে আরও কিছু পাওয়া গেলে খুব ভাল হত, উপকার হত পাপুর। ওর বাবাকে গ্রীসে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে পারত।'

পাপালোর কথা উঠতেই আবার চুপ হয়ে গেল ওরা। বন্ধুকে সাহায্য করার কোন উপায় ঠিক করতে পারল না। বিষণ্ণ মুখে শুতে গেল।

শোবার সঙ্গে সঙ্গেই ঘুমিয়ে পড়ল মুসা আর রবিন। কিশোরের চোখে ঘুম এল না। ভাবনার ঝড় বইছে মাথায়। অনেক দিন পরে হঠাৎ আবার দেখা দিল কেন স্যালি ফ্যারিংটনের ভূত? কঙ্কাল দ্বীপে লোক যাতায়াত করলে কার কি অসুবিধে? তাদেরকে হস্তে ফেলে রেখে এসেছিল কেন হান্ট গিল্ডার? কেন হুমকি দিল ডিক…ডিক…তড়াক করে লাফিয়ে উঠে বসল কিশোর। বুঝে গেছে!

'মুসা, রবিন, জলদি ওঠ!' চেঁচিয়ে ডাকল কিশোর। 'রহস্যের সমাধান করে ফেলেছি!'

চোখ মেলল দুই সহকারী গোয়েন্দা। হাই তুলতে তুলতে তাকাল কিশোরের দিকে।

'কি হয়েছে?' ঘুমজড়িত গলায় জানতে চাইল মুসা। 'দুঃস্বপ্ন দেখেছ?'

'না!' উত্তেজিত কণ্ঠ কিশোরের। 'জলদি কাপড় পর! কঙ্কাল দ্বীপে যেতে হবে! রহস্যের সমাধান করে ফেলেছি!'

লাফ দিয়ে বিছানায় উঠে বসল মুসা আর রবিন।

'ইয়াল্লা!' চেঁচিয়ে উঠল মুসা। 'বল বল…'

বলল কিশোর।

'কিশোর, তোমার তুলনা নেই!' বন্ধুর প্রশংসা না করে পারল না রবিন। 'ঠিক ঠিক বলেছ! একেবারে খাপে খাপে মিলে যাচ্ছে সব কিছু!'

'ইস্‌স্‌, একটা গাধা আমি!' রবিনের কথায় কান দিল না কিশোর। 'আরও আগেই বোঝা উচিত ছিল! জলদি যাও। আমিই যেতাম, কিন্তু সারা শরীরে প্রচণ্ড ব্যথা…'

'না না, তোমার যাবার দরকার নেই,' হাত নেড়ে বলল মুসা। 'তুমি শুয়ে থাক। আমরাই পারব। কিন্তু বাবাকে জানালেই তো পারি। জিমকে নিয়ে তারাও আমাদের সঙ্গে গেলে…'

'না,' মাথা নাড়ল কিশোর। 'আমার অনুমান ভুলও হতে পারে। তাহলে খেপে যাবেন রাফাত চাচা। তোমরা দু'জনেই খুঁজে বের করগে আগে। পেলে, সঙ্গে সঙ্গে গিয়ে জানাবে তাদেরকে।'

পাঁচ মিনিটেই কাপড় পরে তৈরি হয়ে গেল রবিন আর মুসা। টর্চ নিল দু'জনেই। দরজা খুলে বেরিয়ে গেল নিঃশব্দে।

শুয়ে পড়ল আবার কিশোর। ঘুম এল না। ক্ষোভে-দুঃখে ছটফট করছে। কেন লাগল ঠাণ্ডা? কেন এই হতচ্ছাড়া সর্দি ধরে বসল তাকে! নইলে তো রবিন আর মুসার সঙ্গে সে-ও যেতে পারত। রাতটা দ্বীপেই থেকে যেত। তারপর ভোর না হতেই গুপ্তধন শিকারিদের খেলা…গুপ্তধন শিকারি! আবার লাফিয়ে উঠে বসল কিশোর। ভুল হয়ে গেছে, মস্ত ভুল! ভয়ানক বিপদে ঠেলে পাঠানো হয়েছে রবিন আর মুসাকে! খুন হয়ে যেতে পারে ওরা, খুন…

## সতেরো

গায়ের জোরে দাঁড় টানছে মুসা। প্রায় উড়ে চলেছে ছোট্ট নৌকা। এক জেলের কাছ থেকে নৌকাটা ভাড়া নিয়েছে সে। সামনের গলুইয়ের কাছে বসে আছে রবিন। চেয়ে আছে সামনের দিকে। তারার আলোয় অদ্ভুত দেখাচ্ছে কঙ্কাল দ্বীপকে।

'এসে গেছি!' বলে উঠল রবিন।

মোড় ফেরাল মুসা। জেটির কাছে গেল না। প্লেজার পার্কের দিকে এগিয়ে চলল।

ঘ্যাচ করে বালিতে এসে ঠেকল নৌকার সামনের অংশ। লাফিয়ে নেমে পড়ল রবিন। মুসাও নামল। দু'জনে টেনে নৌকাটাকে তুলে আনল ডাঙায়।

'চল, পার্কের ভেতর দিয়ে এগোই,' নিচু গলায় বলল মুসা। 'পার্ক পেরিয়ে পথে নামব, সেদিন যেপথে গুহায় গিয়েছিলাম। খুব সাবধান। জিম টের পেলে চেঁচামেচি শুরু করবে।'

'হ্যাঁ,' মাথা ঝোঁকাল রবিন। 'তবে সঙ্গে ও গেলে ভালই হত।…অন্ধকারে গুহাটা খুঁজে পাবে তো?'

'মনে হচ্ছে পাব,' জবাব দিল মুসা। দ্বিধা করল এক মুহূর্ত। গাঢ় অন্ধকার। নীরব-নিস্তব্ধ। সৈকতে ঢেউ আছড়ে পড়ার একটানা মৃদু ছল-ছলাৎ শব্দ নীরবতাকে আরও গভীর করে তুলেছে যেন। 'চল, এগোই।'

আগে আগে চলেছে মুসা। মাঝে মাঝে টর্চ জ্বেলে দেখে নিচ্ছে সামনের পথ। এসে ঢুকল পার্কে।

কালো আকাশের পটভূমিতে কিম্ভূত এক দানবের মত দেখাচ্ছে সাগরদোলাটাকে। পাশ কাটিয়ে নাগরদোলার কাছে চলে এল দু'জনে। মোড় ঘুরে এগোল। পেছনের ভাঙা বেড়ার কাছে এসে দাঁড়িয়ে পড়ল।

'নাহ্, একা যাব না!' ফিসফিস করে বলল মুসা। 'বাবাকে জাগাব গিয়ে। ভয় পাচ্ছি, তা নয়। আমাদেরকে বোর্ডিং হাউস থেকে বেরোতে নিষেধ করেছে, তবু বেরিয়েছি। কোন বিপদে পড়ার আগেই তাকে জানিয়ে রাখা ভাল।'

'ঠিকই বলেছ,' সায় দিল রবিন। 'চল যাই। তাঁকে জানিয়ে গেলে আর কোন ভয় থাকবে না আমাদের।'

ক্যাম্পের দিকে পা বাড়াতে গিয়েই থমকে গেল দু'জনে। ধড়াস করে উঠল বুকের ভেতর।

কেউ এসে দাঁড়িয়েছে পেছনে। বিশালদেহী কেউ। 'খবরদার! যেখানে আছ, দাঁড়িয়ে থাক!' শোনা গেল গর্জন।

বরফের মত জমে গেল যেন দুই গোয়েন্দা।

আলো জ্বলে উঠল। সামনে চলে এল টর্চের মালিক। দুই কিশোরের মুখে আলো ফেলেই স্থির হয়ে গেল। অবাক কণ্ঠে বলে উঠল, 'আরে একি! তোমরা! এত রাতে চোরের মত এখানে কি করছ?'

দু'জনের চোখের ওপর থেকে আলো সরাল জিম, নিচের দিকে ফেলল। 'ভাগ্যিস, মেরে বসিনি! এতরাতে এখানে কি করছ তোমরা?'

'দ্বীপের রহস্য ভেদ করে ফেলেছে কিশোর,' বলল রবিন। 'তার অনুমান ঠিক কিনা দেখতে এসেছি।'

'দ্বীপের রহস্য!' অবাক কণ্ঠ জিমের। 'কি বলতে চাইছ?'

'সত্যিই গুপ্তধন লুকানো আছে এখানে,' বলল মুসা। 'কিশোরের তাই ধারণা।'

'গুপ্তধন!' ছেলেদের কথা বিশ্বাস করতে পারছে না যেন গার্ড। 'কিসের গুপ্তধন?'

'ওই যে…থেমে গেল মুসা। তার আগেই কথা বলতে শুরু করেছে রবিন। 'আপনার কথা থেকেই সূত্র খুঁজে পেয়েছে কিশোর।'

'আমার কথা থেকে!' বিড়বিড় করল জিম। 'কিছুই বুঝতে পারছি না!'

'সেদিন সকালে বললেন না,' বলল রবিন, 'দুই বছর আগে আর্মার্ড কার লুট করেছিল দুই ভাই? ডিক আর বাড ফিশার? যারা বাঁ হাত নষ্ট করে দিয়েছে আপনার।'

'হ্যাঁ হ্যাঁ। কিন্তু তাতে কি?'

'আপনি আরও বলেছেন,' রবিনের কথার খেই ধরল মুসা। 'কোস্ট গার্ডেরা দু'জনকে ধরে ফেলে। উপসাগরে একটা বোটে ছিল দুই ভাই। কিছু ফেলছিল পানিতে। চোরাই টাকা ফেলেছিল ওরা, লোকের ধারণা।'

'তাই তো করেছিল।'

'এবং,' মুসার কথার খেই ধরল রবিন। 'ঠিক দুই বছর আগে থেকেই কঙ্কাল দ্বীপে আবার ভূতের উপদ্রব শুরু হল। টাকা লুট হল দু'বছর আগে, স্কেলিটন আইল্যাণ্ডের পাশে ধরা পড়ল দুই ডাকাত, দীর্ঘ বিশ বছর পর আবার গোলমাল

শুরু করল দ্বীপের ভূত। ভয় দেখাতে লাগল লোককে। ঘটনাগুলো একটার সঙ্গে আরেকটার মিল যেন খুব বেশি। সন্দেহ জাগল কিশোরের।'

'এত ভনিতা না করে আসল কথা বলে ফেল তো!' অধৈর্য হয়ে উঠছে জিম।

'বুঝতে পারছেন না এখনও?' বলল মুসা। 'বোটে করে পালাতে গেল দুই ডাকাত, ইঞ্জিন খারাপ হয়ে গেল হঠাৎ। ওরা তখন স্কেলিটন আইল্যাণ্ডের কাছাকাছি। এত ঝুঁকি নিয়ে এতগুলো টাকা লুট করেছে, পানিতে ফেলে দেবে সহজে? মোটেই না। কোনভাবে বোটটা তীরে ভিড়িয়ে দ্বীপে উঠেছিল ওরা। টাকাগুলো লুকিয়ে রেখেছিল। তারপর বোট নিয়ে ভেসে পড়েছিল আবার। কোস্টগার্ডের বোট আসতে দেখে টাকা পানিতে ফেলার ভান করেছিল, ফেলেছিল আসলে অন্যকিছু। ভারি কিছু, যা সঙ্গে সঙ্গে তলিয়ে গিয়েছিল। বমাল ধরা না পড়লে খুব বেশি দিন জেল হবে না, ঠিকই বুঝতে পেরেছিল ওরা। জেল থেকে বেরোলে আর কোন ভয় নেই। দ্বীপে এসে টাকাটা নিয়ে দূর কোন দেশে চলে যাবে। কেউ কিছু সন্দেহ করবে না। মাত্র হপ্তাদুয়েক হল ছাড়া পেয়েছে ওরা। সেদিন কিংবা তার পরের দিনই এসে টাকা নিয়ে যেতে পারত, কিন্তু মুশকিল করেছে সিনেমা কোম্পানি। এদিকে এলে ওদের চোখে পড়ে যাবার সম্ভাবনা আছে। ডিক আর বাডকে ঘোরাফেরা করতে দেখলে পুলিশের সন্দেহ জাগতে পারে। সে ঝুঁকি ওরা নেয়নি।'

'সর্বনাশ!' বলে উঠল জিম। 'কি গল্প শোনাচ্ছ! এখানেই টাকা লুকিয়ে রেখেছে ডিক আর বাড! কোথায়, কিছু বলেছে কিশোর?'

'কিশোরের ধারণা,' বলল রবিন, 'শুকনো উঁচু কোন জায়গায় লুকানো হয়েছে। কাপড়ের ব্যাগে ভরা কাগজের টাকা, মাটির তলায় পুঁতে রাখলে পচে যাবে। শুকনো উঁচু সবচেয়ে ভাল জায়গা দ্বীপে...'

'গুহা!' প্রায় চেঁচিয়ে উঠল জিম। 'সেই পুরানো গুহার ভেতরে! কোন তাকের পেছনের খাঁজে! খাঁজের ভেতরে থলেগুলো ঢুকিয়ে সামনে কয়েকটা পাথর ফেলে রাখলেই কেউ দেখতে পারে না! সন্দেহও করবে না কিছু!'

'কিশোরেরও তাই ধারণা,' বলল মুসা। 'টাকাগুলো একমাত্র ওখানেই নিরাপদে থাকবে।'

'ইস্‌স্‌,' অস্থির হয়ে উঠেছে জিম, 'দুটো বছর ধরে টাকাগুলো ওখানে রয়েছে! ঘুণাক্ষরেও মাথায় এল না ব্যাপারটা! যদি কোনভাবে বুঝতে পারতাম...ইস্‌স্‌! চল চল, দেখি, সত্যিই আছে নাকি...'

'আগে রাফাত চাচাকে ডেকে নিয়ে আসি,' বলল রবিন।

'দরকার নেই,' মাথা নাড়ল জিম। 'ওঁরা ঘুমোক। আমরা বের করে নিয়ে আসি আগে। টাকার বস্তা দেখিয়ে চমকে দেব ওঁদেরকে।'

'কিন্তু...' বলতে গিয়েও থেমে গেল মুসা।

ঘুরে হাঁটতে শুরু করেছে জিম। ফিরে চেয়ে বলল, 'এসো আমার সঙ্গে।'

অন্ধকারে দু'পাশের গাছপালাগুলোকে অদ্ভুত দেখাচ্ছে। জিমের পিছু এগিয়ে চলেছে দুই গোয়েন্দা। কেন যেন খচখচ করছে দু'জনের মন। এভাবে যাওয়া ঠিক হচ্ছে না।

'উফ্ফ্!' হঠাৎ শোনা গেল রবিনের চিৎকার। গাছের আড়াল থেকে বেরিয়ে এসে জোরে কাঁধ খামচে ধরেছে কেউ। 'মিস্টার রিভান! কে জানি...' মুখ চেপে ধরল কঠিন একটা থাবা।

পেছনে আরেকটা চাপা শব্দ শুনতে পেল রবিন। মুসার মুখও আটকে দেয়া হয়েছে, অনুমান করল।

ফিরে দাঁড়াল জিম। এগিয়ে এল কাছে। কিন্তু এ-কি! সামান্যতম অবাক হল না তো! কোমরের খাপ থেকে রিভলভারও বের করল না! 'চমৎকার!' বলে উঠল গার্ড। 'চেঁচামেচি করতে পারেনি!'

'আমরা করতে দিইনি বলে,' বলে উঠল রবিনকে ধরে রাখা লোকটা। 'নৌকা দ্বীপে ভেড়াবে, এটাই তো বিশ্বাস হচ্ছিল না তোমার। আরেকটু হলেই তো দিয়েছিল! ক্যাম্পে নিয়ে ওদেরকে জাগালেই...'

'কিন্তু যেতে তো পারেনি,' অস্বস্তি বোধ করছে জিম। 'এখন আর কোন ভয় নেই...'

'কে বলল তোমাকে?' বলল মুসাকে ধরে রাখা লোকটা। 'টাকাগুলো নিয়ে কেটে পড়ার আগে নিরাপদ নই। যে-কোন মুহূর্তে যা খুশি ঘটে যেতে পারে! এই বিচ্ছু দুটোর ব্যবস্থা করা দরকার। চল, বেঁধে নৌকায় ফেলে রাখি। পরে দেখব, কি করা যায়।'

'ঠিক আছে,' রাজি হল জিম। 'আচ্ছা, ডিক, টাকাগুলো কোথায়? গুহায় রেখেছ?'

'ওসব জেনে কাজ নেই তোমার,' ভারি গলায় বলল ডিক। 'সেটা আমাদের ব্যাপার।'

'আমারও!' গম্ভীর কণ্ঠ জিমের। 'তিন ভাগের এক ভাগ আমার। তোমাদের মতই দুটো বছর অপেক্ষা করেছি আমিও। বাঁ হাতটার কথা বাদই দিলাম। যদিও, এটা হারিয়েছি তোমাদের দোষে।'

'থাম! বড় বেশি কথা বল তুমি!' বলল রবিনকে ধরে রাখা লোকটা। 'তোমার ভাগ তুমি পাবে। এখন এক কাজ কর। গায়ের শার্টটা খুলে ছিঁড়ে ফেল। এ-দুটোকে বাঁধতে হবে।'

'কিন্তু...'

'জলদি কর!' ধমকে উঠল লোকটা।

শার্ট খুলে নিল জিম। ছিঁড়ে লম্বা লম্বা ফালি করতে লাগল।

ভাবছে রবিন। ডাকাতদের সঙ্গে হাত মিলিয়েছে জিম। আর্মার কার লুট করতে সাহায্য করেছিল ডিক আর বাডকে। ওকে সন্দেহমুক্ত রাখতে পিস্তল দিয়ে

বাড়ি মেরেছিল ডিক। আঘাতটা একটু জোরেই হয়ে গিয়েছিল। কাঁধের হাড় ভেঙে গিয়েছিল জিমের। ফলে অকেজো হয়ে গেছে বাঁ-হাতটা...'

মুখের ওপর থেকে হাত সরে যেতেই চেঁচিয়ে উঠতে গেল রবিন। কিন্তু তার আগেই কাপড় গুঁজে দেয়া হল। মুখের ওপর দিয়ে পেঁচিয়ে নিয়ে গিয়ে মাথার পেছনে বেঁধে দেয়া হল একটা ফালি। জিভ দিয়ে ঠেলে আর গোঁজটা খুলতে পারবে না সে। দু'হাত পিছমোড়া করে বেঁধে দেয়া হল এরপর।

একইভাবে মুসাকেও বাঁধা হল। পেছন থেকে দুই গোয়েন্দার জ্যাকেটের কলার চেপে ধরল দুই ভাই।

'এবার, বিচ্ছুরা,' বলল ডিক, 'হাঁট। কোনরকম চালাকির চেষ্টা করবে না। দুঃখ পাবে তাহলে।'

জোর ধাক্কায় প্রায় হুমড়ি খেয়ে পড়ার উপক্রম হল, কিন্তু কলার ধরে আছে ডিক, পড়ল না রবিন। পাশে চেয়ে দেখল, একই ভাবে ধাক্কা খেয়ে এগোচ্ছে মুসা।

দ্বীপের অন্য প্রান্তে নিয়ে আসা হল ওদেরকে। সৈকতে বিছিয়ে আছে পাথর। তীরের কাছে নোঙর করা একটা বড় মোটর বোট।

'ওঠ!' রবিনের কাঁধে ধাক্কা মারল ডিক।

উঠে পড়ল দুই গোয়েন্দা। ইঞ্জিনের সামনের খোলা জায়গাটুকুতে নিয়ে আসা হল ওদেরকে।

'বস, বসে পড়!' কাঁধে চাপ পড়ল রবিনের। 'বাড, দড়ি বের কর তো। শক্ত করে বাঁধতে হবে, যেন পালাতে না পারে।'

কাছেই পড়ে আছে বোট বাঁধার দড়ি। অনেক লম্বা। হ্যাঁচকা টান দিয়ে মুসাকে চিত করে শুইয়ে ফেলল বাড। দড়ি তুলে নিয়ে পেঁচিয়ে বেঁধে ফেলল মুসার পা। বাড়তি অংশটুকু দিয়ে রবিনের পা বাঁধল। আরেক টুকরো দড়ি এনে দু'জনের বুকে বুক লাগিয়ে পেচিয়ে বাঁধল।

'ব্যস ব্যস,' বলল ডিক ফিশার। 'আর ছুটতে পারবে না। চল, তাড়াতাড়ি করতে হবে। এমনিতেই অনেক সময় নষ্ট করে ফেলেছি। গুপ্তধন, হুঁহ! খোঁজার জন্যে যে-কোন সময় চলে আসতে পারে ব্যাটারা!'

বোট থেকে নেমে গেল দুই ফিশার।

'তুমি এখানেই থাক, জিম,' শোনা গেল ডিকের কথা। 'চোখ রাখ চারদিকে। সন্দেহজনক কিছু দেখলে প্যাঁচার ডাক ডাকবে।'

'ছেলে দুটোকে কি করবে?' জিমের গলা। 'ওরা বলে দেবে সব। আমি...'

'বলবে না,' কেমন অদ্ভুত শোনাল ডিকের গলা। 'খানিক পরেই ফিরে আসছি আমরা। বোট নিয়ে চলে যাব। তখন ওদের নৌকাটা উল্টো করে ভাসিয়ে দেবে। আগামী কাল ওভাবেই পাওয়া যাবে ওটা। লোকে ধরে নেবে কোন কারণে সাগরে ডুবে মরেছে...'

'বুঝেছি বুঝেছি,' বলে উঠল জিম।

পায়ের শব্দ কানে এল, দু'জোড়া। চলে যাচ্ছে। তারপর নীরবতা।

কথা বলার চেষ্টা করল রবিন। পারল না। অদ্ভুত একটা চাপা আওয়াজ বেরোল শুধু। বাঁধন খোলা যাবে না। বাঁচার কোন উপায় নেই।

# আঠারো

কি ভীষণ বিপদে পড়েছে, বুঝতে অসুবিধে হল না দুই গোয়েন্দার।

ভাবছে রবিন, ঠিকই অনুমান করেছে কিশোর। কঙ্কাল দ্বীপের ওই পুরানো গুহাতেই লুকানো আছে টাকাগুলো। কিন্তু দুই ফিশারের সঙ্গে জিমেরও যোগসাজশ আছে, একথা কিশোরও কল্পনা করেনি। আজ রাতেই টাকা নিতে আসবে দুই ডাকাত, এটাও ভাবেনি। আগামী কাল ভোর থেকেই শুরু হবে গুপ্তধন খোঁজা, নিশ্চয় ঘোষণা করা হয়েছে রেডিওতে। দ্বীপের কোন জায়গা খোঁজা বাদ রাখবে না ওরা। কেউ না কেউ আবিষ্কার করে ফেলবে টাকার থলেগুলো। তাই, ঝুঁকি নিয়েও চলে এসেছে ওরা। টাকাগুলো বের করে নিয়ে যাবার জন্যে। যাবার আগে ওকে আর মুসাকে...'

আর ভাবতে চাইল না রবিন। চারদিক নীরব নিঃশব্দ। কাছে আসছে শুধু নৌকার গায়ে ঢেউয়ের বাড়ি লাগার মৃদু ছলছলাৎ।

হঠাৎ আরেকটা শব্দ কানে এল রবিনের। খুবই মৃদু। বোটের সঙ্গে কিছুর ঘষা লেগেছে, আলতো করে একবার দুলে উঠল। চোখের কোণ দিয়ে দেখতে পেল সে, বোটের ধারে একটা মাথা। আবছা।

অতি সাবধানে উঠতে লাগল মাথাটা। গলা দেখা গেল...কাঁধ...বোটের ভেতরে চলে এল সে। হামাগুড়ি দিয়ে এগিয়ে এল। উঁকি দিয়ে তাকাল একবার তীরের দিকে। আবার মাথা নামাল। রবিন আর মুসার পাশে এসে থামল।

এক মুহূর্ত ঘন ঘন শ্বাস ফেলার শব্দ কানে এল রবিনের। কানের কাছে ফিসফিস করে উঠল একটা কণ্ঠ, 'চুপ! আমি পাপালো!'

পাপালো! ও কি করে এল এখানে! অবাক হয়ে গেল দুই গোয়েন্দা। ওর তো এখন জেলে থাকার কথা!

কিছু একটা বলতে চেষ্টা করল রবিন, গোঙানীর শব্দ হল।

'চুপ!' আবার বলল পাপালো। 'কোন কথা নয়!'

ছুরি দিয়ে বাঁধন কাটতে লাগল পাপালো। মাত্র কয়েক সেকেণ্ড, কিন্তু রবিনের মনে হল কয়েক যুগ পেরিয়ে যাচ্ছে।

কাটা হয়ে গেল বাঁধন। মাথা তুলতে গেল মুসা। হাত দিয়ে চেপে নামিয়ে দিল পাপালো। ফিসফিস করে বলল, 'খবরদার, দেখে ফেলবে! পেছনের দিকে এগোও। পানিতে নামতে হবে।'

হামাগুড়ি দিয়ে এগিয়ে গেল মুসা। তার পেছনে রবিন। সবার পেছনে

পাপালো।
'নেমে পড়!' বলল পাপালো। 'খুব সাবধান! কোন শব্দ যেন না হয়! হালের দণ্ডটা ধরে থাকবে। আমি আসছি।'
হাজারো প্রশ্ন উঁকি দিচ্ছে মনে, পরে জিজ্ঞেস করবে পাপালোকে। আস্তে করে নেমে এল রবিন। শব্দ হল অতি সামান্য, ঢেউয়ের ছলছলাৎ ঢেকে দিল সে শব্দ।
রবিনের পর পরই নামল মুসা। চলে এল পেছনে। রবিন ধরে রেখেছে হালের দণ্ড। সে-ও এসে ধরল।
'খাইছে!' রবিনের কাছে মুখ এনে বলল মুসা। 'ও এল কি করে!'
'জানি না! তবে এসে পড়ায় বেঁচে গেলাম বোধহয়!' ফিস ফিস করে বলল রবিন।
বান মাছের মত পিছলে পানিতে নামল পাপালো। নিঃশব্দে। দুই গোয়েন্দার কাছে চলে এল। 'এসো আমার সঙ্গে। খুব সাবধানে সাঁতরাবে! কোন আওয়াজ যেন না হয়!'
তীরের ধার ধরে সাঁতরে চলল পাপালো, নিঃশব্দে। তাকে অনুসরণ করল দুই গোয়েন্দা। রবিন ভাবছে, জ্যাকেট আর প্যান্ট খুলে নিতে পারলে ভাল হত!
কালো পানি। আবছা কালো তিনটে মাথা, ভাল করে খেয়াল না করলে দেখাই যায় না। কোনরকম শব্দও করল না ওরা। মিনিট দশেক পরে একটা জায়গায় এসে পৌঁছুল। সাগরের দিকে সামান্য ঠেলে বেরিয়ে আছে এখানে সৈকত। ওটা ঘুরে আরেক পাশে চলে এল। বোটটা আর দেখা যাচ্ছে না। জিম রিভানের দৃষ্টির বাইরে চলে এসেছে ওরা।
তীরের দিকে ফিরে সাঁতরাতে শুরু করল পাপালো। অনুসরণ করল দুই গোয়েন্দা।
বালিতে ঢাকা সৈকত নেই এখানে। পানির ওপর নেমে এসেছে ঝোপ ঝাড় আর ছোট ছোট গাছ। একটা শেকড় ধরে উঠে গেল পাপালো। এগিয়ে গিয়ে থামল দুটো বড় পাথরের মাঝে। মুখ বের করে উঁকি দিল। তার পাশে এসে বসেছে দুই গোয়েন্দা। ওরাও উঁকি দিল।
প্রায় তিনশো ফুট দূরে মোটর বোটটা। তারার আলোয় আবছা। জিম রিভানের মুর্তিটা আরও কাছে।
'এবার কথা বলতে পারি,' নিচু গলায় বলল পাপালো। 'আমাদেরকে দেখতে পাবে না ওরা।'
'এখানে এলে কি করে?' একই সঙ্গে প্রশ্ন করল দুই গোয়েন্দা।
মুখ টিপে হাসল পাপালো। 'তোমাদের সঙ্গে কথা বলে শিওর হয়ে এসেছেন হোভারসন, আমি চোর নই। কাজ শেষ করে ফিরে এসেছেন তখন জজ সাহেব। নিজের পকেট থেকে জামিনের পঞ্চাশ ডলার দিয়ে দিয়েছেন চীফ। জামিন হয়েছে হাক স্টিভেন। হাজত থেকে বাড়ি নিয়ে গেলেন আমাকে হোভারসন। খাওয়ালেন।

তারপর ছাড়লেন।'

'কিন্তু এখানে এলে কি করে? কি করে জানলে আমরা এখানে এসেছি?' জিজ্ঞেস করল রবিন।

'সোজা বাসায় চলে গেলাম,' বলল পাপালো। 'বাবাকে যতটা খারাপ অবস্থায় দেখব ভেবেছিলাম, তত খারাপ নয়। পরশী এক মহিলা দেখাশোনা করেছেন। বেরিয়ে এলাম বাইরে। সাগরের দিকে চেয়ে বসে ভাবতে লাগলাম। ছুরিটা ট্রেলারে গেল কি করে? আমাকে চোর বানানর জন্যে কেউ একজন ফেলে রেখেছিল ওখানে ছুরিটা, কে? ছুরিটা হারিয়েছি পরশু, যেদিন গুহায় ঢুকেছিলাম। জিম রিভান তাড়া করল, পালালাম। তার পর থেকেই আর পাইনি ছুরিটা। তারমানে তাড়াহুড়োয় খেয়াল করিনি, ওটা রেখেই পালিয়েছিলাম। এরপর একটা মাত্র লোকের হাতেই পড়তে পারে জিনিসটা, জিম রিভান। তার পক্ষেই ট্রেলারে ঢোকা সহজ, অবশ্যই দরজা দিয়ে। লেন্স চুরি করা সহজ। ট্রেলারের জানালা ওই ভেঙেছে, ছুরিটা ফেলে রেখেছে মেঝেতে। ব্যাটার ওপর চোখ রাখা দরকার মনে করলাম। ঘাটে বাঁধা একটা নৌকা চুরি করে নিয়ে চলে এলাম দ্বীপে।' থামল সে। তারপর বলল, 'নৌকাটা একটা ঝোপের ধারে বেঁধে রেখে চলে গেলাম ক্যাম্পের কাছে। পার্কের দিকে এগোতে দেখলাম জিমকে। পিছু নিলাম। পার্কের পরে ছোট একটা জংলা পেরিয়ে সৈকতে বেরোল সে। দূরে একটা মোটর বোট দেখলাম। হাতের টর্চ সেদিকে করে তিনবার জ্বালাল-নেভাল জিম। তীরে এসে ভিড়ল বোট। তাজ্জব হয়ে দেখলাম, নামল দুই ভাই, ডিক আর বাড ফিশার।'

মুসার দিকে ফিরল পাপালো। হাসল। 'দাঁড় খুব ভাল টানতে পার না তুমি, মুসা। ছপাৎ ছপাৎ শব্দ হচ্ছিল। লুকিয়ে পড়ল তিনজনে। তোমাদের তীরে ওঠার অপেক্ষায় রইল। তারপর আর কি? বোকার মত ধরা পড়লে...'

'সত্যি, তুমি না এলে প্রাণেই মারা পড়তাম আজ।' পাপালোর কাঁধে হাত রাখল রবিন।

'শ্‌ শ্‌ শ্‌!' ঠোঁটে আঙুল রাখল পাপালো। 'ফিশার ব্যাটারা আসছে!'

দুটো মূর্তি এগিয়ে এসে দাঁড়াল জিমের কাছে। দু'জনের হাতে দুটো বড় প্যাকেট, দশ লক্ষ ডলার।

'সব ঠিক আছে?' স্পষ্ট ভেসে এল ডিকের গলা। 'কোন গোলমাল নেই তো?'

'না, গোলমাল নেই,' জবাব দিল জিম। 'শোন, আমার ভাগের টাকাটা দিয়ে দাও।'

'পরে,' বলল বাড ফিশার 'বোটে উঠে দেব। ডিক, জলদি কর। চল উঠে পড়ি।'

পথ রোধ করে দাঁড়িয়ে আছে জিম। ধাক্কা দিয়ে তাকে সরিয়ে দিল বাড। এগিয়ে গেল বোটের দিকে।

বোটে উঠে পড়ল দুই ভাই।

'আরে!' চেঁচিয়ে উঠল বাড। 'বিচ্ছু দুটো কোথায়! জিম, তুমি ছেড়ে দিয়েছ ওদেরকে!'

'আমি ছাড়িনি!' রেগে গিয়ে বলল জিম। 'যাবে কোথায়? আছে, দেখ!'

'নেই!' কর্কশ গলা বাডের।

'কই, দেখি,' বলতে বলতে এগিয়ে এল জিম। আলো ফেলল বোটে। 'আরে, সত্যিই নেই দেখছি! গেল কোথায়! এক চুল নড়িনি আমি জায়গা ছেড়ে!'

'দেখি, প্যাকেটটা দাও,' হাত বাড়াল ডিক। 'জলদি নেমে গিয়ে ধাক্কা দাও। এখুনি পালাতে হবে।'

'কিন্তু আমার ভাগ?' বলল জিম। 'দুটো বছর অপেক্ষা করছি। পুরো দশ লাখ পেলেও আমার হাতের দাম হবে না। সেটা না হয় না-ই বললাম। তোমরা তো পালাবে, আমি যাব কোথায়? ছেলে দুটো পালিয়েছে। গিয়ে বলে দেবে সব। জেলে যাব তো!'

'সেটা তোমার ব্যাপার,' হাত নেড়ে বলল ডিক। 'বাড, ধাক্কা দাও।' স্টার্টারে চাপ দিল সে।

ধাক্কা দিতে গিয়েও থেমে গেল বাড। গায়ের ওপর ঘেঁষে এসেছে জিম। 'খবরদার! প্যাকেট দুটো দিতে বল ডিককে। নইলে…'

'বাড!' শোনা গেল ডিকের আতঙ্কিত চিৎকার। 'বাড, স্টার্ট নিচ্ছে না! জিম, ইঞ্জিনের কি করেছ?'

'আমি কিচ্ছু করিনি,' জবাব দিল গার্ড।

'ইঞ্জিন তো স্টার্ট নিচ্ছে না, এখন কি করব?'

'সেটা তোমাদের ব্যাপার। প্যাকেট দুটো দাও, জলদি!'

আবার চেষ্টা করল ডিক, আবার, কিন্তু স্টার্ট হল না ইঞ্জিন।

অবাক হয়ে দেখল দুই গোয়েন্দা, নীরব হাসিতে ফেটে পড়ছে পাপালো।

'কি হল!' ফিসফিস করে বলল রবিন।

'স্পার্কিং প্লাগের তার ছিঁড়ে ফেলে দিয়েছি,' বলল পাপালো। 'হারামজাদারা! এবার যাও, পালাও! ওই হারামীর বাচ্চা ডিকই আমার নৌকা ভেঙেছে। ওই বোট দিয়েই। এইবার পেয়েছি কায়দায়। চল, ক্যাম্পে গিয়ে লোক ডেকে আনি।'

উঠতে যাবে, এই সময় কানে এল ইঞ্জিনের শব্দ। বসে পড়ল আবার পাপালো, দ্বীপের দিকেই এগিয়ে আসছে একটা বড় মোটর লঞ্চ।

কাছে এসে গেল লঞ্চ। আলো জ্বলে উঠল, সার্চ লাইট। সোজা এসে পড়ল কিশারদের বোটের ওপর।

এক লাফে বোট থেকে নেমে এল ডিক। ছুটল। হকচকিয়ে গেল জিম। এই সুযোগে থাবা মেরে তার হাতের রিভলভার ফেলে দিল বাড। ভাইয়ের পেছনে ছুটল সে-ও।

'আরে!' বলে উঠল পাপালো। 'ব্যাটারা এদিকেই আসছে। দাঁড়াও, দেখাচ্ছি

মজা!' দ্রুত হামাগুড়ি দিয়ে সামনে এগোল সে।

কাছে এসে গেল ডিক। আর দু'কদম ফেললেই ঝোপ পেরিয়ে যাবে। ঠিক তার পেছনেই রয়েছে বাড।

দাঁড়িয়ে উঠে হঠাৎ সামনে পা বাড়িয়ে দিল পাপালো। হোঁচট খেল ডিক। হুমড়ি খেয়ে পড়ল মাটিতে। ভাইয়ের গায়ে হোঁচট খেল বাড। পড়ে গেল সে-ও।

ডিকের ওপর গিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল পাপালো। একনাগাড়ে কিল ঘুষি মারতে লাগল। চেঁচাতে লাগল, 'হারামজাদা! আমাকে হাজতে পাঠিয়েছিলি! ডাকাতের বাচ্চা ডাকাত! চোর বানিয়েছিলি আমাকে...'

উঠে দাঁড়াল বাড। পাপালোর চুল ধরে হ্যাঁচকা টানে সরিয়ে আনল ভাইয়ের ওপর থেকে। চিত করে শুইয়ে ফেলল। পাথরে জোরে ঠুকে দিল মাথা। সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে পা তুলল পাপালো বুক সই করে।

মাথা নুইয়ে খ্যাপা ষাঁড়ের মত ছুটে গেল মুসা। নিগ্রোর খুলি কতখানি শক্ত, তলপেট অনুভব করল বাড। হুঁক্‌ক্‌ করে একটা শব্দ বেরোল মুখ থেকে। চিত হয়ে পড়ে গেল। তার ওপর পড়ল মুসা।

চার হাত-পায়ে ভর দিয়ে উঠতে গেল ডিক, পারল না। পিঠের ওপর লাফিয়ে এসে বসেছে রবিন। আবার হাত-পা ছড়িয়ে উপুড় হয়ে পড়ে গেল সে।

ঝাড়া দিয়ে গায়ের ওপর থেকে মুসাকে ফেলে দিল বাড। উঠে দাঁড়াল হাঁচড়ে-পাঁচড়ে। এই সময় এসে পড়ল জিম। জ্যাকেটের কলার চেপে ধরে সোজা করল বাডকে। ঠেলে নিয়ে চলল সামনের দিকে। ষাঁড়ের জোর তার গায়ে। ওর এক হাতের সঙ্গেই পেরে উঠল না বাড।

ঠেলে বাডকে পানির ধারে নিয়ে চলল জিম। 'আমার সঙ্গে চালাকি! দেখাচ্ছি মজা!'

বাডকে নিয়ে পানিতে পড়ল জিম। কোমর পানি। উঠে দাঁড়াল আবার। মাথা তুলল বাড। জ্যাকেটের কলার এখনও জিমের হাতে।

বাডকে ঠিকমত দম নিতে দিল না জিম। চুবাতে লাগল একনাগাড়ে। রাগে পাগল হয়ে উঠেছে সে। হিতাহিত জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছে।

রবিনকে গায়ের ওপর থেকে ফেলে দিয়ে উঠে দাঁড়াতে গেল ডিক। এবারেও পারল না। প্রায় এক সঙ্গে এসে হাজির হয়েছে মুসা আর পাপালো। দু'হাতে ডিকের দু'পা ধরে উঁচু করে ফেলল মুসা। টান দিল। হাত বাড়িয়ে একটা ছোট গাছের গোড়া ধরে ফেলল ডিক। লাথি মেরে হাতটা সরিয়ে দিল পাপালো। 'এ-হারামজাদাকেও পানিতে ফেল!'

তিন কিশোরের সঙ্গে পেরে উঠলো না ডিক। হিড়হিড় করে টেনে তাকে পানির ধারে নিয়ে এল ওরা।

বাডকে ছাড়ছে না জিম। চোবাচ্ছে এখনও। মেরেই ফেলবে যেন। তার পাশেই ডিককে নিয়ে এসে পড়ল তিন কিশোর।

বাডকে ছেড়ে দিয়েই ডিকের ঘাড় চেপে ধরল জিম। তাকে চুবাতে শুরু করল।

'হয়েছে! ছাড়!' শোনা গেল একটা গম্ভীর আদেশ। 'মেরে ফেলবে তো!'

চমকে ফিরে চাইল তিন কিশোর। তাদের পেছনে কয়েক হাত দূরে এসে গেছে দুটো নৌকা। একটা নৌকায় দাঁড়িয়ে আছেন পুলিশ চীফ হোভারসন। এক হাতে রিভলভার, আরেক হাতে টর্চ।

'ছাড়!' আবার আদেশ দিলেন হোভারসন। 'এই জিম শুনতে পাচ্ছ।'

ডিককে ছেড়ে দিল জিম। সরে যাবার তাল করছিল বাড, তাকে চেপে ধরল। দিল আরেক চুবানি।

'হয়েছে হয়েছে! মেরে ফেলবে, ছেড়ে দাও!' বললেন পুলিশ চীফ।

দুই ডাকাত আর জিমকে টেনে ডাঙায় তুলল কয়েকজন পুলিশ। হাতকড়া পরিয়ে দিল।

ধপাস করে মাটিতে বসে পড়ল দুই ফিশার। প্রচুর মার খেয়েছে। দাঁড়িয়ে থাকার শক্তি নেই।

তিন কিশোরের ওপর আলো ফেললেন হোভারসন। 'একটা কাজের কাজ করেছ তোমরা। পাপু, তুমি এখানে এলে কি করে?'

'প্রশংসা সব ওরই পাওয়া উচিত, চীফ,' পাপালো কিছু বলার আগেই বলে উঠল রবিন। 'ও না এলে আমাকে আর মুসাকে মেরে পানিতে ফেলে দিত ডাকাতগুলো। কিন্তু আপনি এলেন কেন? আজ রাতেই ব্যাটারা টাকা নিতে আসবে জানতেন?'

'না,' মাথা নাড়লেন হোভারসন। 'ব্যাটারা স্কেলিটন আইল্যাণ্ডে টাকা লুকিয়ে রেখেছে, কল্পনাই করিনি কখনও! কিশোর, তোমাদের বন্ধু কিশোর পাশা···মিনিট চল্লিশেক আগে ঝড়ের বেগে এসে ঢুকল থানায়। অদ্ভুত এক গল্প শোনাল। বলল, ফিশার ব্যাটাদের বমাল ধরতে হলে এখুনি যান। এমনভাবে বলল, ওর কথা বিশ্বাস না করে পারলাম না। তাড়াতাড়ি লঞ্চ নিয়ে ছুটে এলাম।'

'কিশোর কোথায়?' জিজ্ঞেস করল মুসা।

'লঞ্চে,' বললেন চীফ। 'জোর করে রেখে এসেছি। গোলাগুলি চলতে পারে, তাই আনিনি।'

## উনিশ

বিশাল টেবিলে পড়ে থাকা মোহরের ছোট স্তূপের দিকে অবাক হয়ে চেয়ে আছেন মিস্টার ডেভিস ক্রিস্টোফার।

'গুপ্তধন তাহলে পেলে!' অবশেষে বললেন পরিচালক। 'সব পাওনি, ঠিক, তবে কিছু তো পেয়েছ!'

'মোট পঁয়তাল্লিশটা,' বলল কিশোর। 'এখানে আছে তিরিশটা, মুসা আর

রবিনের ভাগের। ক্যাপ্টেন ওয়ান-ইয়ারের ধনরাশির তুলনায় কিছুই না।'

'তবু তো ধন, সোনার ডাবলুন,' বললেন মিস্টার ক্রিস্টোফার। 'এখন বল, কেন মনে হল, লুটের টাকা স্কেলিটন আইল্যাণ্ডে লুকানো আছে?'

'সন্দেহটা ঢোকাল স্কেলিটন আইল্যাণ্ডের ভূত,' বলল কিশোর। 'ওসব কুসংস্কারে বিশ্বাস করি না। শুনেই বুঝলাম, দ্বীপে ভূত দেখা যাওয়ার পেছনে মানুষের কারসাজী রয়েছে। কেউ একজন চায় না, ওই দ্বীপে মানুষ যাতায়াত করুক। তখনই প্রশ্ন জাগল মনে, কেন? মূল্যবান কিছু রয়েছে? ক্যাপ্টেন ওয়ান-ইয়ানের গুপ্তধন? ব্যাপারটা নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছি। এই সময় দ্য হ্যাণ্ডের নিচের গুহা আবিষ্কার করে বসল পাপালো। মোহর পেল ওখানে। বুঝে গেলাম, স্কেলিটন আইল্যাণ্ডে ওয়ান-ইয়ানের গুপ্তধন নেই। তাহলে? একসঙ্গে তিনটে কথা এল মনে। প্রায় বিশ বছর পরে হঠাৎ দেখা যেতে শুরু করেছে স্যালি ফ্যারিংটনের ভূত, বছর দুই আগে থেকে। ঠিক দুই বছর আগে লুট হয়েছে দশ লক্ষ ডলার। স্কেলিটন আইল্যাণ্ডের পাশে উপসাগরে ধরা পড়েছে দুই ভাই, ডিক আর বাড ফিশার। ক্যাপ্টেন ওয়ান-ইয়ারের ধরা পড়ার সঙ্গে কোথায় যেন মিল রয়েছে। একটু ভাবতেই বুঝে ফেললাম ব্যাপারটা। ক্যাপ্টেন ওয়ান-ইয়ার মোহর সাগরে ফেলে দেয়নি, লুকিয়ে ফেলেছিল হ্যাণ্ডের গুহায়। ফিশাররাও টাকা পানিতে ফেলে দেয়নি, লুকিয়ে ফেলেছে স্কেলিটন আইল্যাণ্ডের গুহায়। ব্রিটিশ জাহাজের ক্যাপ্টেনকে ফাঁকি দিয়েছিল ওয়ান-ইয়ার, একই কায়দায় পুলিশকে ফাঁকি দিয়েছে ফিশাররা।'

'চমৎকার!' বললেন পরিচালক। 'আরেকটা প্রশ্ন। ডিক আর বাড তো জেলে, ভূত সাজল কে?'

'হান্ট গিল্ডার, এটা আমার অনুমান,' বলল কিশোর, 'জেলে দুই ফিশারের সঙ্গে দেখা করত সে। কোনভাবে ওকে নিয়মিত টাকা দেবার বন্দোবস্ত করেছিল দুই ভাই। বিনিময়ে মাঝে মাঝেই দ্বীপে গিয়ে ভূত সেজে জেলেদেরকে দেখা দিত হান্ট। আসল কারণটা নিশ্চয় জানত না, তাহলে টাকাগুলো খুঁজে বের করে নিয়ে চলে যেত।'

'যেমন যেত গার্ড জিম রিভান,' বললেন মিস্টার ক্রিস্টোফার।

'হ্যাঁ,' মাথা ঝোঁকাল কিশোর। 'জিম জানত না, দ্বীপেই লুকানো আছে টাকাগুলো। শুধু এটুকু জানত, কোথাও লুকিয়ে রেখেছে দুই ভাই। জেল থেকে বেরিয়ে এসে বের করবে। তার ভাগ তাকে দিয়ে দেবে।'

'যখন জানল, তার নাকের ডগায়ই রয়েছে টাকাগুলো,' হেসে বলল রবিন, 'কি আফসোসই না করল!'

হ্যাঁ,' কিশোরের গলায় ক্ষোভ। 'নিশ্চয় দেখার মত হয়েছিল তার মুখের ভাব! সর্দির জন্যে তো যেতে পারলাম না...'

'সিনেমা কোম্পানির জিনিসপত্র চুরি করল কে?' জিজ্ঞেস করলেন পরিচালক। 'জিম আসার আগেই তো শুরু হয়েছিল চুরি!'

'নিশ্চয় হান্ট,' বলল কিশোর। 'চোর হিসেবে বদনাম আছে ওর এমনিতেই।

চুরি করতে গিয়ে ধরা পড়লে, ব্যাপারটাকে সাধারণ চুরি হিসেবেই নিত পুলিশ অন্য কিছু সন্দেহ করত না।'

'কাজটা অন্যকে দিয়ে করানর কি দরকার?' বললেন পরিচালক। 'জেল থেকে তো বেরিয়েছে তখন দু'ভাই। ওরা করলেই পারত? আর এত সব ঝামেলার মধ্যে গেল কেন? চুপচাপ এক রাতে গিয়ে টাকাগুলো বের করে নিয়ে চলে আসতে পারত।'

'পারত না,' বলল কিশোর। 'আমার ধারণা, হান্ট টাকার গন্ধ পেয়ে গিয়েছিল। দু'বছর ভূত সেজেছে সে। অনেক টাকা পেয়েছে দুই ভাইয়ের কাছ থেকে। এত টাকা খামোকা ব্যয় করেনি ডিক আর বাড, এটা বুঝবে না, অত বোকা নয় সে। দুই ফিশারের ভয় ছিল, টাকা আনতে গেলে পিছু নেবেই হান্ট, দেখে ফেলবে। তখন তাকে একটা ভাগ দিতে হবে। হান্টের ব্ল্যাকমেলের শিকার হবারও ভয় ছিল ওদের। তাই তো কৌশলে সরাল ওকে।'

'কি কৌশল?' জানতে চাইলেন পরিচালক।

'আমরা যাব, কথাটা ছড়িয়ে পড়ল শহরে। জেনে গেল ডিক আর বাড। বুঝল, হান্টকে সরানর এই সুযোগ। আমাদেরকে কিডন্যাপ করে দ্য হ্যাণ্ডে রেখে আসতে ওকে পাঠাল ওরা। নিশ্চয় অনেক টাকা পেয়েছে, বোকার মত কাজটা করে বসল হান্ট। ফিরে এসে সব কথা জানালাম আমরা পুলিশকে। পিছু লাগল পুলিশ। শহর ছেড়ে পালাতে বাধ্য হল হান্ট।' থামল কিশোর। তারপর আবার বলে চলল, 'হান্ট চলে গেল। সিনেমা কোম্পানি থেকেই গেল দ্বীপে। চুরি বন্ধ করা চলবে না। জিমকে ধরল দুই ভাই। সুন্দর সুযোগ। কোম্পানি একজন গার্ড চায়। জিম হলে খুব ভাল হবে। নিজেই চাকরির দরখাস্ত নিয়ে গেল জিম। হয়ে গেল চাকরি। ঘরের-ইঁদুর বেড়া কাটতে লাগল। দ্বীপটার আশেপাশে খুব বেশি ঘোরাফেরা করে পাপালো। গুপ্তধন খুঁজে বেড়ায়। যদি কখনও গুহায় ঢুকে টাকার বাণ্ডিল দেখে ফেলে, এই ভয়ে তার ওদিকে যাওয়া বন্ধ করতে চাইল দুই ফিশার গুজব রটিয়ে দিল, পাপালো চোর। সিনেমা কোম্পানির জিনিসপত্র সে-ই চুরি করে। তাকে দেখলেই লাঠি নিয়ে তাড়া করে জিম। এই সময় আমরা গিয়ে হাজির হলাম। জোর পেল পাপালো। শুধু গুজব রটিয়ে ওকে আর ঠেকানো যাবে না, বুঝতে পারল দুই ভাই। সময় মত জিম পেয়ে গেল পাপালোর ছুরিটা। জানাল দুই ডাকাতকে। সুযোগটা লুফে নিল ওরা। লেন্স চুরি করাল জিমকে দিয়ে, ট্রেলারের জানালা ভাঙল, মেঝেতে ছুরিটা ফেলে রাখা হল, লেন্সগুলো নিয়ে গিয়ে পাপালোর বিছানার নিচে রেখে দিয়ে এল ডিক কিংবা বাড। পরের দিন আরেকটা সুযোগ পেয়ে গেল ডিক। দ্য হ্যাণ্ডের দিকে গিয়েছে পাপালো, জানল কোনভাবে। পিছু নিল। ভেঙে দিয়ে এল নৌকাটা। ব্যস, একেবারে নিশ্চিন্ত হয়ে গেল। কোন কারণে যদি পাপালোকে ছেড়েও দেয় পুলিশ, ও আর গুপ্তধন খুঁজতে যেতে পারবে না। কিন্তু বড় একরোখা পাপালো হারকুস, ওকে শেষ অবধি ঠেকাতে পারল না দুই

ফিশার। ওরই জন্যে ধরা পড়েছে ওরা, প্রাণে বেঁচেছে মুসা আর রবিন।'

'হুঁ!' আস্তে মাথা ঝাঁকালেন মিস্টার ক্রিস্টোফার। 'আচ্ছা, কিছু করে এসেছ ওর জন্যে? সাহায্যের কথা বলছি।'

'আমাদের কিছু করতে হয়নি,' কথা বলল মুসা। 'নিজের ব্যবস্থা নিজেই করে নিয়েছে পাপু।'

'কি?'

'গুপ্তধন শিকারের ওপর যে ছবিটা করা হয়েছে, তাতে মূল ভূমিকা তার দেখানো হয়েছে। দ্য হ্যাণ্ডের গুহা থেকে ডুবে ডুবে মোহর তুলে আনছে সে, এই দৃশ্যের ছবিও তোলা হয়েছে। মিস্টার জন নেবারের সঙ্গে আলোচনা করে বেশ মোটা অংকের পারিশ্রমিক দিয়েছে তাকে বাবা। ট্রেজার-হান্টার ছবিতে অভিনয়ের জন্যে।'

'খুব ভাল, খুব ভাল,' খুশি হলেন পরিচালক। 'আর কিছু?'

'পরিবহন কোম্পানির দশ লাখ ডলার ফিরে পাওয়ার ব্যাপারে পাপালোর কৃতিত্বই বেশি,' বলল কিশোর। 'তাকে একটা পুরস্কার দিয়েছে কোম্পানি। পঁচিশ হাজার ডলার।'

'বাহ্, বেশ বড় পুরস্কার তো!' বললেন পরিচালক।

বাবাকে নিয়ে দেশে ফিরে যাবে পাপালো,' বলল কিশোর। 'ভালভাবে চিকিৎসা করাবে। একটা বোট কিনে মাছের ব্যবসা শুরু করবে। আশা পূরণ হয়েছে তার।'

'হুম্‌ম্‌,' মাথা ঝোঁকালেন পরিচালক। 'তোমাদের এই অ্যাডভেঞ্চার কাহিনী নিয়ে খুব ভাল একটা ছবি হবে। ভাবছি, পুরোটাই শূটিং করব স্কেলিটন আইল্যাণ্ড আর আশপাশের দ্বীপগুলোতে। যেখানে যা যা যেভাবে ঘটেছে, ঠিক তেমনি ভাবে। পাপালোর চরিত্রটা তাকে দিয়েই অভিনয় করালে কেমন হয়?'

'খুব ভাল হয়!' একই সঙ্গে বলে উঠল তিন গোয়েন্দা।

ঘড়ি দেখলেন পরিচালক। 'ঠিক আছে। নতুন কোন রহস্যের খোঁজ পেলে জানাব।'

ইঙ্গিতটা বুঝল তিন কিশোর। উঠে দাঁড়াল। মোহরগুলো টেনে নিল মুসা। বেছে বেছে একটা ভাল মোহর—যেটা কম ক্ষয় হয়েছে, তুলে নিয়ে বাড়িয়ে ধরল। 'এটা আপনাকে দিলাম, স্যার। আপনার সংগ্রহে রেখে দেবেন।

'থ্যাংক ইউ, মাই বয়,' মোহরটা নিতে নিতে বললেন পরিচালক।

ঘর থেকে বেরিয়ে গেল তিন গোয়েন্দা।

হাতের তালুতে নিয়ে মোহরটার দিকে চেয়ে রইলেন মিস্টার ক্রিস্টোফার। বিড়বিড় করলেন, 'সত্যিকারের জলদস্যুর গুপ্তধন!' হাসলেন আপন মনেই। 'দারুণ ছেলেগুলো! কী সুন্দর সুন্দর কাহিনীর জন্ম দিচ্ছে! ভাবছি, এরপর কি অ্যাসাইনমেন্ট দেয়া যায় তিন গোয়েন্দাকে!'

-০-